NAHWA EDITIONS · NE-006 · ১০ অধ্যায়

মা বাবা, আমি আর আমাদের দূরত্ব

পরিবারের না বলা কথা, পারস্পরিক সম্মান ও দূরত্ব কমানোর চেষ্টা নিয়ে নয়টি অধ্যায় ও একটি বোনাস।

পাঠ সংস্করণ R1 · স্বাধীন পর্যালোচনা চলমান

সংরক্ষিত সম্পাদিত v0.2 মূলপাঠ থেকে বইয়ের মতো অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠাবিন্যাসে সাজানো হয়েছে। মূল আলোচনা, আরবি পাঠ, সূত্র এবং সম্পাদকীয় সতর্কতা রাখা হয়েছে। এটি স্বতন্ত্র আলেম, ইতিহাসবিশেষজ্ঞ বা স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞের চূড়ান্ত অনুমোদনের দাবি নয়। প্রয়োজনীয় সতর্কতা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের সঙ্গে পড়ুন। PDF থেকে বাংলা কপি করার ফল viewer অনুযায়ী বদলাতে পারে।

সূচিপত্র ১০টি অধ্যায়

১ যখন মনে হয়, “মা বাবা আমার কেউ না”

২ মা বাবার সঙ্গে তর্ক করা কি সত্যিই হারাম? তাঁরা ভুল বললে আমি কী করব?

৩ তাঁরা যখন খুব রেগে যান, তখন আমি কী করব?

৪ মা বাবা ভুল করলে কীভাবে বলব? সম্মান করতে গিয়ে কি সবকিছু চুপ করে সহ্য করতে হবে?

৫ যখন মনে হয়, “আমার পরিবারই আমাকে সামনে এগোতে দেয় না”

৬ রাগ করে বাসা থেকে বের হয়ে যেতে ইচ্ছে করলে কী করবেন?

৭ ঘরের কষ্ট থেকে যখন নেশার দিকে পালাতে ইচ্ছে করে

৮ যখন মনে হয়, “আর বাঁচতে চাই না”

৯ এত কিছুর পরেও সম্পর্কটা কি আবার সুন্দর করা সম্ভব?

১০ বোনাস | বেকার সন্তান, মা বাবা আর প্রতিদিনের চাপ

সূত্রতালিকা

অধ্যায় ০১

যখন মনে হয়, “মা বাবা আমার কেউ না”

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> সম্পাদকীয় সীমা: এটি মূল লেখকের পারিবারিক পরামর্শ। নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য ফতোয়া, রোগনির্ণয় অথবা নির্যাতনের নিরাপত্তা পরিকল্পনার বিকল্প নয়।

ঝগড়াটা হয়তো খুব বড় কিছু নিয়ে শুরু হয়নি। আপনি একটা কথা বলতে চেয়েছিলেন, মা মাঝখানেই থামিয়ে দিলেন। বাবা হয়তো এমন একটা কথা বললেন, যেটা অন্য কেউ বললে আপনি পাত্তাই দিতেন না, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে শুনে বুকের ভেতর কোথাও গিয়ে লাগল। আপনিও চুপ থাকতে পারলেন না। একটা কথার জবাবে আরেকটা কথা বললেন। তারপর গলার স্বর উঁচু হলো। পুরোনো অভিযোগ বের হলো। “তুমি কোনোদিন আমাদের কথা শোনো না”, “তোমার জন্য আমরা কী কম করেছি?”, “তোমাকে দিয়ে জীবনে কী হবে?” কিছুক্ষণ পর আর কেউ আসল বিষয়টা নিয়েই কথা বলছে না। সবাই শুধু কষ্টের জবাবে কষ্ট দিচ্ছে।

একসময় আপনি নিজের ঘরে চলে এলেন। দরজা বন্ধ করলেন। ফোন হাতে নিয়ে বসে আছেন, কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। বাইরে হয়তো মা এখনও কিছু বলছেন, কিংবা বাসা একদম চুপ। আপনার মাথার ভেতর শুধু ঘুরছে, “আমাকে এরা বুঝেই না।” একটু পর সেটাই বদলে হয়, “আমার মা বাবাই যদি আমার পাশে না থাকে, তাহলে আমার কে আছে?” রাগটা আরও গভীর হলে মনে হয়, “ওরা আমার কেউ না। আমি কেন এত ভাবি এদের নিয়ে?”

কিন্তু কয়েক ঘণ্টা আগেও এই মানুষগুলোর জন্যই তো আপনার চিন্তা হয়েছে। মা বাইরে গেলে দেরি হচ্ছে দেখে ফোন দিয়েছেন। বাবা অসুস্থ হলে আপনার মন খারাপ হয়েছে। তাঁদের কোনো প্রয়োজন হলে নিজের কাজ ফেলে ছুটেছেন। তাহলে হঠাৎ করেই কেন মনে হচ্ছে তাঁরা আপনার কেউ নন? কারণ রাগের মুহূর্তে আমাদের মন অনেক সময় একটা কাজ করে। তখনকার কষ্টটাকে পুরো সম্পর্কের পরিচয় বানিয়ে ফেলে। "এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে তারা আমাকে বুঝছে না" কথাটা খুব সহজে বদলে যায় "তারা কোনোদিনই আমাকে বোঝে না" কথায়। "আজকের কথায় আমি খুব কষ্ট পেয়েছি" বদলে যায় "তারা আমাকে ভালোবাসেই না" কথায়।

এই দুই জিনিস এক নয়। আপনার কষ্টটা সত্য হতে পারে। মা সত্যিই অন্যায়ভাবে কথা বলতে পারেন। বাবা সত্যিই আপনার কথা না শুনেই সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। তাঁরা হয়তো আপনাকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করেন, পুরোনো ব্যর্থতা টেনে আনেন, আপনার পছন্দকে ছোট করে দেখেন, কিংবা ভালো চেয়েও এমন ভাষায় কথা বলেন যে ভালোবাসার চেয়ে অপমানটাই বেশি লাগে। তখন খারাপ লাগবে। খুব খারাপও লাগতে পারে। ইসলাম আপনাকে পাথর হতে বলে না। মা বাবা বলেছেন বলে চোখে পানি আসবে না, বুক ভাঙবে না, কোনো আচরণকে ভুল মনে হবে না, এমন কোনো শিক্ষা ইসলাম দেয়নি।

কষ্ট পাওয়া আর বেয়াদবি করা এক কথা নয়। কারও কথায় আহত হওয়া আর তাঁর হক অস্বীকার করা এক কথা নয়। মা বাবার কোনো আচরণকে ভুল মনে হওয়া আর তাঁদের অসম্মান করা এক কথা নয়। বরং আসল পরীক্ষা শুরু হয় তখন, যখন আপনার সত্যিই মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে অন্যায় হয়েছে। তখন আপনি নিজের জিহ্বাকে কোথায় থামাবেন? নিজের রাগকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করবেন? কারণ সুন্দর ব্যবহার করা খুব সহজ যখন অপর পক্ষও সুন্দর ব্যবহার করছে। কঠিন তখনই, যখন আপনি আহত, রাগান্বিত, অপমানিত, তবু জানেন সামনে যাঁরা আছেন তাঁরা আপনার মা বাবা।

আল্লাহ বলেন, "তাদের 'উফ' পর্যন্ত বলো না, তাদের ধমক দিও না এবং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো।" এরপর আল্লাহ তাঁদের জন্য দু'আ করতে শেখান, "হে আমার রব, তাঁদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন।"

সূরা আল ইসরা, ১৭:২৩ থেকে ২৪। এখানে শুধু ভরণপোষণের কথা নেই। কথা বলার ভঙ্গিটাও এর মধ্যে আছে। কারণ অনেক সন্তান মা বাবার প্রয়োজন পূরণ করে, টাকা দেয়, ডাক্তার দেখায়, কিন্তু রাগের সময় এমনভাবে কথা বলে যে সেই কথার কষ্ট বহুদিন থেকে যায়।

আবার মা বাবার প্রতি আদবের অর্থ এই নয় যে তাঁদের প্রতিটি কথা সঠিক। কুরআন নিজেই এমন পরিস্থিতির কথা বলেছে, যখন মা বাবা সন্তানকে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করার মতো ভয়াবহ অন্যায়ের দিকে ডাকেন। আল্লাহ বলেন, সেই বিষয়ে তাঁদের আনুগত্য করবে না, তবু দুনিয়াতে তাঁদের সঙ্গে সুন্দরভাবে থাকবে। সূরা লুকমান, ৩১:১৪ থেকে ১৫। অর্থাৎ ইসলাম আমাদের এমন একটা ভারসাম্য শেখায় যেখানে ভুলকে ভুল বলা যায়, কিন্তু ভুলের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজের চরিত্র নষ্ট করা যায় না। মা বাবা ভুল করতে পারেন। সন্তানও কষ্ট পেতে পারে। তবু সম্পর্কের আদবের একটা সীমা থাকে।

ধরুন, আপনার বাবা রাগের মাথায় বললেন, “তুই কোনোদিন কিছু করতে পারবি না।” এই একটা কথাই হয়তো আপনাকে সারাদিন অস্থির করে রাখল। অথচ কোনো অপরিচিত মানুষ একই কথা বললে হয়তো দুই মিনিট পর ভুলে যেতেন। বাবার কথাটা এত বেশি লাগে কেন? কারণ তাঁর মতামতের মূল্য আপনার কাছে আছে। আপনি চান তিনি আপনার ওপর বিশ্বাস রাখুন। মা যখন অন্য কারও ছেলে মেয়ের সঙ্গে তুলনা করেন, তখন শুধু তুলনাটাই কষ্ট দেয় না। তার ভেতরে একটা অদৃশ্য প্রশ্ন জেগে ওঠে, “আমি কি তোমার কাছে কখনোই যথেষ্ট হব না?” আমরা অনেক সময় রাগ দেখাই, কিন্তু রাগের নিচে লুকিয়ে থাকে স্বীকৃতি পাওয়ার ইচ্ছা, ভালোবাসা পাওয়ার আশা, গ্রহণযোগ্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

তাই “ওরা আমার কেউ না” কথাটার নিচে অনেক সময় আসলে অন্য একটা কথা থাকে, “ওরা আমার সবচেয়ে আপন বলেই ওদের কথায় এত কষ্ট পাই।” আপনি যদি সত্যিই তাঁদের নিয়ে ভাবতেন না, তাহলে তাঁদের কথায় এত রাতে ঘুম হারাম হতো না। অভিমানও তো সাধারণত তার ওপরই হয়, যার কাছে আমাদের প্রত্যাশা আছে।

সমস্যা হলো, আমরা এই আসল কষ্টটা বলতে পারি না। আমরা বলি না, “আব্বু, ওই কথাটা শুনে আমার খুব খারাপ লেগেছে। আমি অনেক চেষ্টা করছি, কিন্তু আপনার মুখ থেকে এমন কথা শুনলে মনে হয় আপনি আমার ওপর একদম বিশ্বাস করেন না।” বরং বলি, “আপনি কোনোদিন আমাকে বুঝবেন না।” আমরা বলি না, “আম্মু, অন্যদের সঙ্গে তুলনা করলে আমার নিজের কাছে নিজেকে খুব ছোট লাগে।” বলে ফেলি, “আপনার তো নিজের সন্তান ভালো লাগে না, অন্যরাই ভালো।” ওপাশের মানুষ তখন আপনার কষ্টটা শোনার আগেই নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনতে পান। তিনিও আত্মপক্ষ সমর্থন শুরু করেন। “তোমার ভালোর জন্য বলি, সেটাও এখন অপরাধ?” এখান থেকে কথাটা আরও খারাপ হয়।

একই বাসায় তখন অদ্ভুত একটা দৃশ্য তৈরি হয়। মা রান্নাঘরে কাজ করতে করতে ভাবছেন, “আমার সন্তান এত বদলে গেল কীভাবে?” বাবা হয়তো চুপচাপ বসে আছেন, মুখে কিছু বলছেন না, কিন্তু মনে কষ্ট, “আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলল?” আর সন্তান নিজের ঘরে ভাবছে, “এই বাড়িতে আমাকে কেউ বোঝে না।” তিনজনই কষ্ট পাচ্ছেন। তিনজনই হয়তো তিনজনকে ভালোবাসেন। কিন্তু কেউ কারও ভালোবাসার জায়গাটা দেখতে পারছেন না, কারণ সবার সামনে তখন শুধু নিজের আঘাতটাই বড় হয়ে আছে।

এই অবস্থায় সবচেয়ে বিপজ্জনক জিনিস হলো রাগের মুহূর্তকে জীবনের স্থায়ী সিদ্ধান্ত বানিয়ে ফেলা। “আমি আর কোনোদিন কথা বলব না”, “আমি বাসা ছেড়ে চলে যাব”, “এরা মরলেও আমার কিছু যায় আসে না”, “আমার আর পরিবার লাগে না”, এসব কথা অনেক সময় মানুষ সত্যি বিশ্বাস করে বলে না। রাগ তার মুখ দিয়ে বলায়। কিন্তু রাগ চলে গেলেও কথাগুলো থেকে যায়। মা হয়তো সেই একটি বাক্য বছরের পর বছর মনে রাখেন। সন্তানও পরে অনুতপ্ত হয়, কিন্তু তখন আর কথাটা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

তাই এমন মুহূর্তে নিজেকে একটা প্রশ্ন করুন, “আমি কি সত্যিই আমার মা বাবাকে হারাতে চাই, নাকি আমি চাই তাঁরা আমার কষ্টটা বুঝুক?” অনেকের উত্তর এখানেই বদলে যাবে। আপনি হয়তো তাঁদের হারাতে চান না। আপনি শুধু চান বাবা একবার আপনার কথা শেষ পর্যন্ত শুনুন। চান মা আপনাকে অন্যের সঙ্গে তুলনা না করে

জিজ্ঞেস করুন, “তুই আসলে কী চাস?” চান তাঁরা আপনার চেষ্টা দেখুন। চান একটা ভুলের পর আপনাকে পুরো মানুষ হিসেবে বাতিল না করে দেন। চান নিজের ঘরটাকে এমন জায়গা মনে হোক যেখানে ব্যর্থ হয়েও ফিরে আসা যায়।

এগুলো চাওয়া অন্যায় নয়। কিন্তু এগুলো পাওয়ার জন্য এমনভাবে কথা বললে, যাতে আপনার কষ্টের চেয়ে আপনার ব্যবহারের কথাই বড় হয়ে যায়, তখন আপনি নিজের কথাটাই দুর্বল করে ফেলেন। তাই রাগ খুব বেড়ে গেলে কথা থামানো অনেক সময় ভালো। পালিয়ে যাওয়া নয়, দরজা আছাড় দেওয়া নয়, সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা নয়। শুধু বলা, “আমি এখন খুব রেগে আছি। এই অবস্থায় কথা বললে হয়তো খারাপ কিছু বলে ফেলব। একটু পরে শান্ত হয়ে কথা বলি।” এই কথাটুকু অনেক বড় ঝগড়াকে থামাতে পারে।

শান্ত হওয়ার পরে নিজের দিকটাও দেখুন। শুধু “তাঁরা কী বলেছেন” সেটা নয়, “আমি কী বলেছি” সেটাও। বাবা অন্যায় কথা বলেছেন বলে আপনার চিৎকার ঠিক হয়ে যায় না। আপনি গলা উঁচু করেছেন বলে বাবার কষ্টদায়ক কথাটাও ঠিক হয়ে যায় না। একই ঘটনায় দুজনেরই ভুল থাকতে পারে। নিজের কাছে তখন তিনটা কথা জানতে চান। কোন কথাটায় আমি সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি? রাগের সময় আমি এমন কী বলেছি যা বলা উচিত হয়নি? আমি আসলে মা বাবার কাছে কী চাইছিলাম, কিন্তু ঠিকভাবে বলতে পারিনি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনেক সময় রাগের ভেতর লুকিয়ে থাকা আসল সমস্যাটা সামনে আনে।

আরেকটা জিনিসও আমাদের বুঝতে হবে। সব মা বাবা একইভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারেন না। গতকাল মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আজ সকালে তিনি এসে শুধু বললেন, “খেয়েছিস?” আপনার রাগ আরও বেড়ে গেল। মনে হলো, “কাল এত কিছু বললেন, আজ এমন করছেন যেন কিছুই হয়নি।” হতে পারে তিনি সত্যিই নিজের ভুল বুঝতে পারছেন না। আবার এটাও হতে পারে, তিনি “আমি দুঃখিত” বলতে শেখেননি।

তাঁর কাছে ভাত বাড়িয়ে দেওয়া, ফল কেটে রাখা, আপনার পছন্দের কিছু রান্না করা, “কয়টায় বের হবি?” জিজ্ঞেস করা, এগুলোই কাছে আসার ভাষা। এতে তাঁর আগের ভুল ঠিক হয়ে যায় না। কিন্তু সব ভালোবাসা মুখে “সরি” বলে আসে না, এটাও সত্য।

মা বাবারও শেখার আছে। সন্তানকে খাবার দেওয়া, পড়াশোনার খরচ দেওয়া, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা ভালোবাসা, কিন্তু শুধু এগুলোই ভালোবাসা নয়। সন্তানের কথা শোনা, তাকে অপমান না করা, অন্যের সঙ্গে তুলনা না করা, তার ব্যর্থতার সময় পাশে থাকা, তার অনুভূতিকে তুচ্ছ না করা, এগুলোও ভালোবাসা। “আমি তোমার ভালোর জন্য বলছি” বললেই সব ভাষা ঠিক হয়ে যায় না। ভালো চাওয়া আর ভালোভাবে বলা দুটোই দরকার।

তবে এই লেখা যে সন্তান পড়ছে, তার হাতে প্রথমে নিজের অংশটুকুই আছে। অন্য মানুষ কখন বদলাবেন, কীভাবে বদলাবেন, সেটা আপনি ঠিক করতে পারবেন না। কিন্তু আপনি ঠিক করতে পারেন রাগের সময় কী বলবেন, কোথায় থামবেন, নিজের কষ্ট কীভাবে বোঝাবেন, নিজের ভুল হলে কীভাবে স্বীকার করবেন। সম্পর্ক ঠিক করার শুরু সবসময় বড় কোনো আবেগঘন কথোপকথন দিয়ে হয় না। কখনো শুধু নিজের ঘর থেকে বের হয়ে এসে স্বাভাবিকভাবে বসা, মায়ের দেওয়া চায়ের কাপ নেওয়া, বাবার দরকারি কথার উত্তর দেওয়া, এগুলো দিয়েও বরফ গলতে শুরু করে।

নিজের ভুল থাকলে একদিন বলতে পারেন, “কাল আমি যেভাবে কথা বলেছি, ওভাবে বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার সত্যিই অনেক কষ্ট হয়েছে। আপনি সময় দিলে শান্তভাবে বলতে চাই।” এই একটি কথার মধ্যে অনেক কিছু আছে। আপনি নিজের ভুলটুকু স্বীকার করলেন, কিন্তু নিজের কষ্ট অস্বীকার করলেন না। মা বাবার ভুলকেও ঠিক বলে দিলেন না। একই সঙ্গে কথার দরজাটাও বন্ধ করলেন না।

তবে একটা সীমার কথা পরিষ্কার থাকা দরকার। যদি বিষয়টা সাধারণ ঝগড়া বা মতের অমিলের বাইরে চলে যায়, যদি নিয়মিত অপমান, মারধর, ভয় দেখানো, অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ বা আপনার নিরাপত্তার জন্য বাস্তব ঝুঁকি থাকে, তখন শুধু “মা বাবা তো, সহ্য

করো” বলে বিষয়টা চাপা দেওয়া ঠিক নয়। বিশ্বস্ত আত্মীয়, দায়িত্বশীল আলেম, কাউন্সেলর বা প্রয়োজনীয় পেশাদার সহায়তা নেওয়া অসম্মান নয়। পরিবারের সম্মান রক্ষার অর্থ এই নয় যে ক্ষতিকর পরিস্থিতির কথা কাউকে বলা যাবে না।

শেষে একটা কথাই মনে রাখুন। আজ আপনার খুব রাগ হতে পারে। আজ মনে হতে পারে, “ওরা আমার কেউ না।” কিন্তু সেই অনুভূতিটাকে একটু সময় দিন। হয়তো কাল বুঝবেন, কথাটা পুরো সত্য ছিল না। আপনি এত রাগ করেছেন কারণ তাঁদের কাছ থেকে আপনার প্রত্যাশা ছিল। এত কষ্ট পেয়েছেন কারণ তাঁদের কথার দাম আপনার কাছে আছে।

হয়তো আপনার মনের গভীর কথাটা আসলে “ওরা আমার কেউ না” নয়। হয়তো কথাটা হলো, “ওরা আমার এত আপন, তাই ওদের কাছ থেকে পাওয়া কষ্টটাও এত বেশি লাগে।” কষ্টটাকে অস্বীকার করবেন না। কিন্তু কষ্টের মুহূর্তকে আপনার সম্পর্কের শেষ কথা বানাবেন না।

অধ্যায় ০২

মা বাবার সঙ্গে তর্ক করা কি সত্যিই হারাম? তাঁরা ভুল বললে আমি কী করব?

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট

সম্পাদকীয় সূত্র নোট: ন্যায়সঙ্গত কাজে আনুগত্যের বর্ণনা সহিহ বুখারি ৭২৫৭ এ আছে। নির্দিষ্ট বিয়ে, শিক্ষা, কাজ বা বাসস্থানের বিরোধের বিধান এই সাধারণ আলোচনাই চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে না।

“তোমার ওই বন্ধুর সঙ্গে আর মিশবে না।” বাবা কথাটা বললেন। আপনি কারণটা বোঝাতে গেলেন, কিন্তু পুরো কথা শেষ করার আগেই তিনি বলে দিলেন, “আমি যা বলেছি, সেটাই হবে।” আপনি আবার বললেন, “কিন্তু আব্বু, আপনি তো পুরো ব্যাপারটা জানেন না।” এবার উত্তর এলো, “আমার সঙ্গে তর্ক করো না।” আপনি চুপ করে গেলেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা প্রশ্ন ঘুরতে থাকল, “তাহলে কি আমার কিছু বলারই অধিকার নেই? মা বাবা ভুল বুঝলেও আমাকে চুপ থাকতে হবে?” অনেক ছেলে মেয়ের জীবনে এই দৃশ্যটা খুব পরিচিত। কোনো বিষয়ে নিজের ব্যাখ্যা দিতে গেলেই শুনতে হয়, “মুখে মুখে কথা বলো কেন?” একসময় সন্তান নিজেই বুঝতে পারে না, কোনটা নিজের কথা বলা আর কোনটা বেয়াদবি। আবার কখনো সে এই কথার প্রতিবাদ করতে করতে সত্যিই এমন জায়গায় চলে যায় যেখানে আর বোঝানোর চেষ্টা থাকে না, থাকে শুধু কে কাকে হারাবে সেই লড়াই। তাই “মা বাবার সঙ্গে তর্ক করা যাবে না” কথাটা শুধু শুনে থেমে গেলে সমস্যার সমাধান হয় না। বুঝতে হবে, তর্ক বলতে আমরা কী বোঝাচ্ছি, মতের অমিল কোথায়, আর অসম্মান কোথা থেকে শুরু হচ্ছে।

ইসলামের মূল শিক্ষা এ বিষয়ে খুব পরিষ্কার। আল্লাহ বলেন, “তাদের ‘উফ’ পর্যন্ত বলো না, তাদের ধমক দিও না এবং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো।” সূরা আল ইসরা, ১৭:২৩। এরপর তাঁদের জন্য দু‘আ করতে শেখানো হয়েছে, “হে আমার রব, তাঁদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন।” সূরা আল ইসরা, ১৭:২৪। অর্থাৎ মা বাবার সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে শুধু দায়িত্ব পালন নয়, ভাষারও একটা হক আছে। আপনি তাঁদের প্রয়োজন পূরণ করেন, টাকা দেন, চিকিৎসা করান, কিন্তু রাগের সময় এমনভাবে কথা বলেন যে মানুষটা অপমানিত হয়ে যান, তাহলে শুধু দায়িত্ব পালন করলেই আদব পূর্ণ হয় না। কিন্তু এখানেই আরেকটা ভুল হয়। কেউ কেউ এই আয়াত শুনে মনে করেন, তাহলে মা বাবা যা বলবেন সেটাই চুপ করে মানতে হবে। অথচ কুরআন নিজেই এমন অবস্থার কথা বলেছে যেখানে মা বাবা সন্তানকে শিরকের দিকে ডাকছেন। আল্লাহ বলেছেন, সেই বিষয়ে তাঁদের আনুগত্য করবে না, কিন্তু দুনিয়াতে তাঁদের সঙ্গে সুন্দরভাবে থাকবে। সূরা লুকমান, ৩১:১৪ থেকে ১৫। অর্থাৎ খুব পরিষ্কার একটা শিক্ষা পাওয়া যায়। ভুল কথা না মানা যায়, কিন্তু মানুষটাকে অপমান করা যায় না।

এখন ধরুন মা আপনাকে একটা বিষয়ে ভুল বুঝেছেন। আপনি বললেন, “আম্মু, ব্যাপারটা আসলে এমন না। আপনি একটু শুনলে আমি বুঝিয়ে বলতে পারি।” এটা তর্ক নয়। আপনি নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করছেন। কিন্তু তিনি আপনার কথা মানলেন না। আপনি আবার বললেন। তিনিও আবার বললেন। কয়েক মিনিট পর আপনার ভেতরের উদ্দেশ্য বদলে গেল। এখন আর আপনি শুধু তাঁকে বিষয়টা বোঝাতে চাইছেন না, আপনি চান তিনি স্বীকার করুন যে তিনি ভুল এবং আপনি ঠিক। তিনি একটা কথা বললেই আপনি তার দশটা জবাব দিচ্ছেন। তিনি কথা শেষ করার আগেই থামিয়ে দিচ্ছেন। “আপনি সবসময় এমন করেন”, “আপনি কোনোদিন আমার কথা বুঝবেন না”, “আপনার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই” এসব বের হতে শুরু করল। তখন আর আসল বিষয়টা কোথাও থাকে না। কথাটা হয়ে যায় শক্তির লড়াই। কে শেষ কথা বলবে, কে কাকে চুপ করাবে, কে নিজের অবস্থান ছাড়বে না। আপনার যুক্তি হয়তো সত্যিই বেশি

শক্তিশালী, কিন্তু যুক্তিতে ঠিক হওয়া আর আচরণে ঠিক হওয়া একই জিনিস নয়। মানুষ কখনো সত্য কথা বলেও গুনাহের মতো ভাষা ব্যবহার করতে পারে, কাউকে অপমান করতে পারে, নিজের অহংকে সত্যের নামে চালাতে পারে। তাই মা বাবার সঙ্গে কোনো বিষয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হলে শুধু "আমি ঠিক কি না" দেখলেই হবে না, এটাও দেখতে হবে "আমি এখন কীভাবে কথা বলছি?"

একই কথা বলার ভঙ্গি বদলালে পুরো কথোপকথনের ফল বদলে যেতে পারে। "আব্বু, আপনি কিছুই বোঝেন না, আপনার সময় আর এখনকার সময় এক না" বললে কথাটা শুনেই তাঁর ভেতরে প্রতিরোধ তৈরি হবে। কিন্তু "আব্বু, আপনার চিন্তার কারণটা আমি বুঝতে পারছি। আমার পরিস্থিতিটা একটু আলাদা, আপনি পাঁচ মিনিট শুনলে আমার দিকটা বলতে চাই" বললে একই দ্বিমত সম্মানের মধ্যে থাকে। "আম্মু, আপনি সবসময় আমার জীবন control করতে চান" বললে তাঁর মনে হবে আপনি তাঁর পুরো মাতৃত্বকেই অভিযুক্ত করছেন। কিন্তু "আম্মু, আমি জানি আপনি আমার ভালো চান, কিন্তু আমার কথা না শুনেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে খুব অসহায় লাগে" বললে তিনি অন্তত বুঝতে পারেন আপনার কষ্টটা কোথায়। এসব কোনো কৃত্রিম ভদ্রতা নয়। নিজের কথা দুর্বল করে দেওয়াও নয়। বরং এমনভাবে বলা যাতে সামনের মানুষ আপনার কথাটা শুনতে পারেন। কারণ আমরা অনেক সময় সত্য বলার নামে এমনভাবে বলি যে মানুষটা আর সত্য শুনতেই পারেন না, তিনি শুধু অপমানটা শুনতে থাকেন।

আরেকটা সমস্যা হয় যখন আমরা একটি নির্দিষ্ট ঘটনা থেকে পুরো সম্পর্কের বিচার শুরু করি। বিষয় ছিল আপনার পড়াশোনা, কথার মধ্যে বলে ফেললেন, "আপনারা কোনোদিন আমাকে support করেননি।" বিষয় ছিল রাতে দেরি করে ফেরা, আপনি বলে ফেললেন, "এই বাসায় আমার কোনো স্বাধীনতা নেই।" বিষয় ছিল কোনো আত্মীয়ের বাসায় যাওয়া, কথা ঘুরে দাঁড়াল, "আপনাদের কাছে আত্মীয়রাই সব, নিজের সন্তান কিছু না।" তখন মা বাবাও পুরোনো হিসাব খুলে বসেন। "তোমাকে ছোটবেলা থেকে কী কম করেছি?" "তোমার জন্য এত কিছু করলাম।" কয়েক মিনিটে বর্তমান সমস্যাটা হারিয়ে যায়, তার জায়গায় পুরো পরিবারের ইতিহাস চলে আসে। তাই কোনো

কঠিন বিষয়ে কথা বলতে গেলে যতটা সম্ভব সেই বিষয়েই থাকুন। “আপনি সবসময়”, “আপনি কোনোদিন”, “আপনার জন্য আমার জীবন নষ্ট” ধরনের বাক্য মানুষকে নিজের ভুল দেখতে সাহায্য করে না, বরং নিজের পক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য করে। আপনার লক্ষ্য যদি হয় তাঁরা আপনার কষ্টটা বুঝুন, তাহলে এমন ভাষা ব্যবহার করতে হবে যা কথার দরজা খোলা রাখে। সব কথা জিততে হয় না, কিছু কথা পৌঁছাতে হয়।

কিন্তু আপনি সুন্দরভাবে বললেন, তবুও তাঁরা শুনলেন না। এখানেই অনেক তরুণের ধৈর্য শেষ হয়ে যায়। মনে হয়, “আমি তো ভালো করেই বললাম, এখন না বুঝলে চিৎকার করেই বলব।” অথচ সব সত্য মানুষকে একই মুহূর্তে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আপনার বাবা হয়তো রেগে আছেন, মা হয়তো মানসিকভাবে চাপে আছেন, আপনি নিজেও তখন শান্ত নন। সেই অবস্থায় রাত দুইটা পর্যন্ত তর্ক করে কাউকে স্বীকার করানো যে “হ্যাঁ, তুমি ঠিক”, এটা কোনো বাধ্যবাধকতা নয়। কখনো বলা যায়, “আব্বু, মনে হচ্ছে আমরা দুজনেই এখন রেগে যাচ্ছি। আমি আর বাড়াতে চাই না। পরে শান্ত হয়ে কথা বলি।” তারপর সত্যিই সরে আসা যায়। এটা হেরে যাওয়া নয়। বরং নিজের রাগকে নিজের ওপর কর্তৃত্ব করতে না দেওয়া। অনেক ছেলে মেয়ে মনে করে, কথা থামিয়ে দিলে মা বাবা ভাববেন তারা জিতে গেছে। কিন্তু পরিবার আদালত নয়। এখানে কে জিতল, কে হারল, সেই হিসাব করতে করতে অনেক সম্পর্কই হারিয়ে যায়।

এখানে আরেকটা দিক মা বাবারও বোঝা দরকার। সন্তান নিজের মত বললেই সেটা বেয়াদবি নয়। “আমি একমত নই” বলা আর “আপনি কিছু বোঝেন না” বলা এক কথা না। “আমি এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে অস্বস্তিতে আছি” বলা আর “আমার জীবনে আপনাদের কোনো অধিকার নেই” বলা এক না। ছোটবেলা থেকে যদি কোনো সন্তান নিজের কথা বলতে গেলেই শুনে, “মুখে মুখে তর্ক করিস?”, তাহলে সে ধীরে ধীরে কথা বলা বন্ধ করে দিতে পারে। বাইরে থেকে তাকে খুব বাধ্য মনে হবে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে পরিবার থেকে দূরে যেতে থাকবে। একসময় তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কথা মা বাবা সবার শেষে জানতে পারেন, কারণ সে শিখে গেছে বাড়িতে সত্যি কথা বললে ঝামেলা হবে। এটা ভালো সম্পর্কের লক্ষণ নয়। সন্তানকে আদব শেখানো দরকার, কিন্তু এমন

নিরাপত্তাও দরকার যেখানে সে বলতে পারে, “আব্বু, আমি আপনার সঙ্গে একমত না”, এবং সেই একটি বাক্যের কারণে তাকে অবাধ্য সন্তান ঘোষণা করা হবে না। আবার সন্তানেরও মনে রাখতে হবে, মতের অমিলের অধিকার পাওয়া মানে গলার volume বাড়ানোর অধিকার পাওয়া নয়। “আমি তো সত্য কথাই বলেছি” বলার আগে দেখতে হবে চোখের ভাষা কেমন ছিল, কণ্ঠের ভাষা কেমন ছিল, কথার মাঝখানে কেটে দেওয়া হয়েছে কি না, বিদ্রূপ ছিল কি না, দরজা আছাড় দিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে কি না।

আমাদের মা বাবার প্রজন্মের অনেকেই সন্তানের সঙ্গে বসে অনুভূতি নিয়ে কথা বলার পরিবেশে বড় হননি। তাঁরা ভালোবাসা দেখিয়েছেন অন্যভাবে। খাইয়েছেন, পড়িয়েছেন, নিজের ইচ্ছা বাদ দিয়ে সন্তানের প্রয়োজন পূরণ করেছেন, টাকা জমিয়েছেন, অসুস্থ রাতে জেগেছেন। তাই সন্তান যখন বলে, “তোমরা আমাকে বোঝো না”, কথাটা তাঁদের কাছে অনেক সময় খুব নিষ্ঠুর লাগে। তাঁদের মনে হয়, “এত কিছু করলাম, তারপরও বলে আমরা বুঝি না?” অথচ সন্তান হয়তো বলতে চেয়েছিল, “তোমরা আমার জন্য অনেক কিছু করেছ, কিন্তু এই একটা কষ্টের জায়গাটা বুঝতে পারছ না।” দুজনের বাক্যের ভেতরের অর্থ আলাদা, কিন্তু দুজনই বাইরে থেকে সবচেয়ে কঠিন কথাটা শুনছে। এজন্য শব্দ বেছে নেওয়া এত গুরুত্বপূর্ণ। “আপনারা আমাকে কখনো support করেননি” বলার বদলে বলা যায়, “এই সিদ্ধান্তটায় আপনাদের support আমার খুব দরকার।” “আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না” এর বদলে বলা যায়, “আমি চাই আপনি আমাকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখেন।” “আপনি আমার জীবন নষ্ট করছেন” এর বদলে বলা যায়, “এই সিদ্ধান্তটা যদি আমার মতের বাইরে হয়, আমি ভয় পাচ্ছি পরে আমার ভেতরে অনেক ক্ষোভ তৈরি হবে।” নিজের অনুভূতিকে সৎভাবে বলা যায়, কাউকে আঘাত করার জন্য শব্দ ধারালো না করেও।

আর সব মতের অমিল একই ধরনের নয়। কোনো কিছু স্পষ্টভাবে হারাম হলে মা বাবা বললেও সেটা মানা যাবে না। আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে কারও আনুগত্য নেই। কিন্তু তখনও ভাষা যতটা সম্ভব নরম রাখা যায়। ধরুন বাবা এমন কোনো কাজ করতে বললেন যেটাকে আপনি পরিষ্কারভাবে হারাম জানেন। বলা যেতে পারে, “আব্বু, আপনার কথা

না রাখতে আমারও খারাপ লাগছে, কিন্তু এই কাজটা আমি আল্লাহর নিষেধের কারণে করতে পারব না। অন্য কোনো উপায় থাকলে আমরা সেটা দেখি।" এতে আপনি না বলেছেন, কিন্তু তাঁকে "আপনি হারাম হালাল বোঝেন না" বলে ছোট করেননি। আবার ক্যারিয়ার, পড়াশোনা, চাকরি, ব্যবসা, বিয়ে, কোথায় থাকবেন, এসব বিষয়ে মতের অমিল আরও জটিল হতে পারে। সেখানে প্রতিটি ঘটনার হুকুম এক বাক্যে বলা যায় না। প্রয়োজনে নিজের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি কোনো যোগ্য ও বিশ্বস্ত আলেমকে খুলে বলা যেতে পারে। কিন্তু শুধু এই কারণে যে সন্তান মা বাবার সঙ্গে কোনো সিদ্ধান্তে একমত হয়নি, তাকে সঙ্গে সঙ্গে বেয়াদব বা নাফরমান বলে দেওয়া ঠিক নয়।

কঠিন কোনো কথা বলার সময় সময় এবং জায়গাটাও গুরুত্বপূর্ণ। বাবা সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন, আপনি দরজা দিয়েই জীবনের সবচেয়ে sensitive সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। মা দশটা কাজ নিয়ে রান্নাঘরে ব্যস্ত, তখন তাঁর সামনে জমে থাকা সব অভিযোগ খুলে দিলেন। কথাটা খারাপ হলো, তারপর মনে হলো "তাঁরা আমাকে বুঝতে চান না।" কখনো সমস্যাটা শুধু বিষয় না, সময়ও। একইভাবে অন্য মানুষের সামনে মা বাবাকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও তাঁরা defensive হয়ে যেতে পারেন। আত্মীয়দের সামনে বাবাকে corner করে সত্য প্রমাণ করলে হয়তো আপনি যুক্তিতে জিতলেন, কিন্তু তাঁর কাছে সেটা সম্মানের প্রশ্ন হয়ে গেল। সম্ভব হলে ব্যক্তিগত কথা ব্যক্তিগতভাবেই বলুন। নিজের কথা বলার পরও যদি তাঁরা না বোঝেন, তাহলে পরিবারের এমন একজন বড় মানুষ, কোনো দায়িত্বশীল আলেম বা এমন কাউকে মাঝখানে আনা যায় যাঁকে তাঁরা সম্মান করেন। সমাধান যদি সত্যিই লক্ষ্য হয়, তাহলে "আমাকেই তাঁকে বুঝাতে হবে" এই অহংটাও ছাড়তে হয়।

ঝগড়ার পরে একা হলে একটা প্রশ্ন নিজেকে করতে পারেন, "আমি কি আমার কথাটা বোঝাতে চেয়েছিলাম, নাকি শেষ পর্যন্ত তাঁকে হারাতে চেয়েছিলাম?" যদি মনে হয় একটা সময়ের পর আপনি শুধু শেষ কথা বলার জন্য কথা বলেছেন, তাহলে হয়তো সেখানেই আলোচনা তর্কে বদলে গিয়েছিল। আর যদি সত্যিই যথাসম্ভব সম্মান রেখে নিজের কথা বলেছেন, তবু তাঁরা মানেননি, তাহলে সব দায় নিজের ওপরও নেবেন না।

সুন্দরভাবে বলা আপনার দায়িত্ব, সবাইকে আপনার কথা মানানো আপনার হাতে নেই। মা বাবার প্রতি আদব মানে নিজের ব্যক্তিত্ব মুছে ফেলা নয়। আবার নিজের ব্যক্তিত্বের অর্থ তাঁদের সঙ্গে যে ভাষায় ইচ্ছা কথা বলাও নয়। আপনি বলতে পারেন, “আমি একমত নই।” বলতে পারেন, “এই কথায় আমি কষ্ট পেয়েছি।” বলতে পারেন, “এই সিদ্ধান্তটা আমি অন্যভাবে দেখতে চাই।” কোনো অন্যায় নির্দেশ হলে মানতেও অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু চেষ্টা করবেন এমনভাবে বলতে, যেন কথোপকথন শেষে সমস্যাটা থেকে যায় হলেও সম্পর্কটা পুরোপুরি ভেঙে না যায়।

কারণ মা বাবার সঙ্গে সব বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব না। বয়স আলাদা, অভিজ্ঞতা আলাদা, ভয় আলাদা, সময় আলাদা, জীবন দেখার ধরনও আলাদা। কোনো কোনো বিষয়ে আপনি ঠিক হবেন, কোনো কোনো বিষয়ে কয়েক বছর পরে বুঝবেন তাঁরা যা বলেছিলেন তার মধ্যে সত্যিই একটা কারণ ছিল। কিন্তু আপনি ঠিক প্রমাণিত হলেও তাঁদের অপমান করা ঠিক হয়ে যায় না, আর তাঁরা মা বাবা বলেই তাঁদের প্রতিটি কথা সঠিক হয়ে যায় না। এই দুই সত্য একসঙ্গে ধরে রাখাটাই পরিণত হওয়ার অংশ।

আপনার কথা বলার অধিকার আছে। কিন্তু সেই কথারও একটা আদব আছে। আর কখনো কখনো সবচেয়ে শক্ত উত্তর হলো উত্তরটা একটু পরে দেওয়া।

অধ্যায় ০৩

তাঁরা যখন খুব রেগে যান, তখন আমি কী করব?

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> সম্পাদকীয় সূত্র নোট: রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাকে প্রকৃত শক্তি বলার বর্ণনা সহিহ বুখারি ৬১১৪ এর সঙ্গে মিলেছে। তাৎক্ষণিক বিপদের ক্ষেত্রে নিজেকে নিরাপদ করা অগ্রাধিকার।

আপনি হয়তো নিজের ঘরে বসে ছিলেন। হঠাৎ বাবা ডাকলেন। কোনো একটা বিষয়ে তিনি আগে থেকেই রেগে আছেন। আপনি সামনে যেতেই প্রশ্ন শুরু হলো। আপনি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি আপনার কথা শেষ করতে দিচ্ছেন না। গলার স্বর বাড়ছে। পুরোনো ঘটনাও উঠে আসছে। একটু পর মা এসে কিছু বললেন, তিনিও রেগে গেলেন। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন আর মনে হচ্ছে, “আমি কিছু বললেও সমস্যা, চুপ থাকলেও সমস্যা।” বুকের ভেতর ধড়ফড় করছে। মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। একটা সময় মনে হয়, “আর কত? আমিও আজ সব বলে দেব।” অনেক ছেলে মেয়ের জীবনে ঝগড়ার সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তটা এখানেই। কারণ তখন সমস্যাটা আর শুধু মা বাবা কী বলছেন সেটা থাকে না। আপনার নিজের শরীরও যেন আপনাকে পাল্টা আঘাত করতে বলছে। গলা শক্ত হয়ে আসে, মুখ দিয়ে এমন কথা বের হতে চায় যা স্বাভাবিক অবস্থায় আপনি হয়তো বলতেন না। পরে ঘরে ফিরে আফসোস হয়, কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল চুপ থাকলে যেন আপনি হেরে যাচ্ছেন।

রাগের সময় মানুষের ভেতরে এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আপনি যখন অপমানিত, অভিযুক্ত বা অন্যায়ভাবে দোষী মনে করেন নিজেকে, তখন মন খুব দ্রুত নিজের পক্ষে দাঁড়াতে চায়। বিশেষ করে কথাগুলো যদি মা বাবার কাছ থেকে আসে, আঘাতটা আরও

বেশি লাগে। কারণ তাঁদের কাছেই তো আপনি নিরাপদ থাকতে চেয়েছিলেন। তাই বাবা যখন বলেন, “তোমার দ্বারা কিছু হবে না”, আপনি শুধু একটা বাক্য শোনেন না। আপনার ভেতরে সেটা কখনো হয়ে যায়, “আমার বাবা আমার ওপর বিশ্বাসই করেন না।” মা যখন বলেন, “অমুকের মেয়েটাকে দেখো, আর তোমাকে দেখো”, তখন আপনার কানে শুধু তুলনা আসে না, মনে হয়, “আমি কি তোমার কাছে এতটাই খারাপ?” তখন জবাব দিতে ইচ্ছে করাটা বোঝা যায়। কিন্তু এখানেই একটা কঠিন সত্য আছে। আপনার রাগের কারণ ন্যায্য হতে পারে, কিন্তু রাগের মধ্যে আপনি যা কিছু করবেন তার সবটাই ন্যায্য হয়ে যায় না। বাবা অন্যায়ভাবে কথা বললে সেটার দায় তাঁর। কিন্তু আপনি তার জবাবে যে কথাটা বললেন, সেটার দায় আপনার।

রাসূলুল্লাহ ﷺ শক্তিশালী মানুষকে নতুনভাবে চিনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রকৃত শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয় যে কুস্তিতে অন্যকে হারায়, বরং শক্তিশালী সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে এই অর্থের হাদিস এসেছে। আমরা অনেক সময় শক্তি বলতে পাল্টা জবাব দিতে পারাকে বুঝি। “উনি আমাকে বললে আমিও বলব। আমি কি মানুষ না?” কিন্তু সব জবাব মুখ দিয়ে দিতে হয় না। কখনো আপনি খুব ভালো করেই জানেন কোন কথাটা বললে বাবাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করা যাবে। তাঁর কোনো ব্যর্থতা, কোনো পুরোনো ভুল, কোনো দুর্বল জায়গা আপনার জানা আছে। রাগের মুহূর্তে সেটা মুখের সামনে এনে দিলেন। হয়তো তিনি সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে গেলেন। বাইরে থেকে মনে হলো আপনি জিতে গেছেন। কিন্তু কিছু জয় আছে, যেগুলোর দাম পরে সম্পর্ক দিয়ে দিতে হয়। মা বাবাকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষমতা থাকা আর সেই ক্ষমতাটা ব্যবহার না করা, এই জায়গাটাও চরিত্রের অংশ।

তাহলে তাঁরা চিৎকার করলে আপনি কি শুধু দাঁড়িয়ে সব শুনবেন? সব পরিস্থিতিতে না। শান্ত থাকা আর নিজেকে অপমানের জন্য দাঁড় করিয়ে রাখা এক কথা নয়। প্রথম কাজ হলো বুঝতে চেষ্টা করা, এই মুহূর্তে কথোপকথন আদৌ কথোপকথন আছে কি না। বাবা যদি খুব রেগে থাকেন, আপনি একটা বাক্য বললেই তিনি আরও দশটা বলছেন, আর আপনার নিজেরও নিয়ন্ত্রণ হারানোর অবস্থা, তখন সেই মুহূর্তে সমস্যার সমাধান করার

চেষ্টা বন্ধ করা ভালো। নরমভাবে বলতে পারেন, “আব্বু, আমি আপনার কথা শুনছি। কিন্তু এখন আমরা দুজনই খুব রেগে আছি। আমি ভয় পাচ্ছি আমিও খারাপভাবে কথা বলে ফেলব। একটু পরে কথা বলি?” মাকে বলতে পারেন, “আম্মু, আমি পালাচ্ছি না। আমি শুধু একটু শান্ত হতে চাই। পরে আপনার সঙ্গে বসে কথা বলব।” এই ভাষার উদ্দেশ্য তাঁদের চুপ করানো নয়। আপনি নিজের জিহ্বাকে বাঁচানোর জন্য কিছুটা সময় নিচ্ছেন। তবে বলেই এমনভাবে চলে যাবেন না যেন দরজা আছাড় দিয়ে নিজের কথাটাই প্রমাণ করে দিলেন। সরে যাওয়ার ভঙ্গিটাও কথার অংশ।

কখনো আবার সরে যাওয়ার সুযোগও থাকবে না। বাবা বলছেন, “কোথাও যাবে না, এখানে দাঁড়াও।” তখন কী করবেন? তখন উত্তর ছোট করুন। প্রতিটা অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে নিজের defence শুরু করবেন না। সব ভুল বোঝাবুঝি ওই পাঁচ মিনিটেই পরিষ্কার করতে হবে না। “জি, আমি শুনছি”, “এই জায়গাটা আমি পরে একটু বুঝিয়ে বলতে চাই”, “আমি বুঝতে পারছি আপনি খুব রেগে আছেন”, এমন ছোট উত্তর পরিস্থিতি আরও না বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে তিনি যা বলছেন সব সত্য বলে মেনে নিলেন। আপনি শুধু বুঝছেন, এখন যুক্তি দেওয়ার সময় না। একটা মানুষ যখন রাগের চূড়ায় থাকে, তখন দশটা যুক্তি তার কাছে দশটা প্রতিবাদ মনে হতে পারে। আপনি যদি প্রতিটি বাক্যের ভুল ধরতে যান, “না, এটা হয়নি”, “আপনি ভুল বলছেন”, “আমি তো সেটা বলিনি”, “কিন্তু আপনি আগে...” তাহলে খুব দ্রুত কথাটা আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে। পরে যখন পরিবেশ স্বাভাবিক হবে, তখন এক এক করে বলবেন কোন জায়গায় আপনার কথা ছিল।

একটা ভুল আমরা খুব করি। মা বাবা রেগে গেলে আমরা তাঁদের গলার স্বরের সঙ্গে নিজেদের গলার স্বর মিলিয়ে ফেলি। তিনি জোরে বললেন, আমিও একটু জোরে বললাম যাতে আমার কথা শোনা যায়। তিনি আরও জোরে বললেন, আমিও আরও জোরে। কিছুক্ষণ পর কে কী বলছে সেটা আর কারও মাথায় থাকে না। শুধু শব্দের উচ্চতা বাড়তে থাকে। তখন খুব সাধারণ একটা বাক্যও আঘাতের মতো শোনায়। আপনি যদি দেখেন নিজের গলাও চড়ে যাচ্ছে, ইচ্ছা করে স্বর নিচু করুন। সবসময়

এতে অপর পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হবে না, কিন্তু অন্তত আপনার নিজের নিয়ন্ত্রণ ফেরে। পানি পান করতে পারেন। দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়তে পারেন, সম্ভব হলে জায়গাটা বদলাতে পারেন। অযু করাও অনেকের জন্য মনকে থামানোর ভালো একটা উপায় হতে পারে। এগুলো কোনো জাদুর কৌশল নয় যে করলেই অন্য মানুষ বদলে যাবে। লক্ষ্য হচ্ছে, সেই কয়েক মিনিটে নিজের ভেতরে এমন জায়গা তৈরি করা যাতে রাগ আপনার হয়ে সিদ্ধান্ত না নেয়।

আর একটা জিনিস খুব দরকার। রাগের সময় মা বাবার মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি কথাকে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিচয় বানিয়ে ফেলবেন না। বাবা বলেছেন, “তোর দ্বারা কিছু হবে না।” এটা কষ্টদায়ক কথা, বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু সেই বাক্য আপনার ভবিষ্যতের ঘোষণা না। মা বলেছেন, “তুই আমাদের কোনোদিন শান্তি দিলি না।” হয়তো তিনি গভীর হতাশা থেকে অতিরঞ্জিত করে বলেছেন। সেটাও আপনাকে ভালো সন্তান হওয়ার সব সম্ভাবনা থেকে বের করে দেয় না। মানুষের রাগের ভাষা অনেক সময় মানুষের স্থির বিশ্বাসের ভাষা হয় না। তবে এর মানে এইও নয় যে কথাগুলো কষ্ট দেয় না বা নিয়মিত এমন কথা বলাটা ঠিক। শুধু এতটুকু মনে রাখবেন, কারও রাগের মুহূর্তের একটা বাক্যকে নিজের মূল্য নির্ধারণের কাগজ বানাবেন না। না হলে প্রতিবার ঝগড়ার পর আপনি শুধু সম্পর্ক নিয়ে না, নিজের পুরো জীবন নিয়েও ভেঙে পড়বেন।

পরিস্থিতি শান্ত হলে বিষয়টা চাপা দিয়ে সব স্বাভাবিক করে ফেলাও সবসময় ভালো সমাধান নয়। যদি কোনো কথা আপনাকে সত্যিই আঘাত করে, পরে সময় দেখে বলুন। তবে সেই আলোচনায় নতুন করে মামলা খুলবেন না। “কাল আপনি যা বলেছেন, তার মধ্যে একটা কথা আমার খুব লেগেছে। আপনি বলেছিলেন আমার দ্বারা কিছু হবে না। আমি জানি আপনি রাগে বলেছিলেন, কিন্তু ওই কথাটা আমি এখনও মাথা থেকে বের করতে পারছি না।” এইভাবে বললে আপনি নিজের অভিজ্ঞতাটা জানাচ্ছেন। “আপনি আমাকে ঘৃণা করেন”, “আপনি খারাপ বাবা”, “আপনি সবসময় আমাকে ভাঙেন” বললে সামনের মানুষ আবার নিজেকে defend করতে শুরু করবেন। কখনো নিজের ভুলটাও একই সঙ্গে বলা যায়, “আমিও কাল গলা উঁচু করেছি। সেটা ঠিক হয়নি। কিন্তু

আমরা যদি দুজনই এমন কথা না বলি যেগুলো পরে থেকে যায়, তাহলে হয়তো ঝগড়াটা এতদূর যাবে না।” মা বাবার সঙ্গে সম্পর্ক মেরামতের অনেক কথাই এভাবে শুরু হয়। কেউ একবারে বদলাবেন না। কখনো একই কথা কয়েকবার শান্ত সময়ে বলতে হবে।

তবে সব পরিবারে বিষয়টা এত সহজ নয়। কিছু ছেলে মেয়ে এমন ঘরে থাকে যেখানে চিৎকার শুধু মাঝে মাঝে নয়, প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। সামান্য ভুলে গালাগালি, অপমান, জিনিস ছোড়া, মারধর, ভয় দেখানো হয়। সেখানে “শান্ত থাকো” বললেই দায়িত্ব শেষ হয় না। যদি আপনি বুঝতে পারেন পরিস্থিতি শারীরিকভাবে unsafe হয়ে যাচ্ছে, তখন প্রথম কাজ তর্ক জেতা না, নিজের নিরাপত্তা। সম্ভব হলে নিরাপদ জায়গায় যান। বিশ্বস্ত আত্মীয়, পরিবারের দায়িত্বশীল বড় কেউ, শিক্ষক, কাউন্সেলর বা এমন কোনো মানুষকে জানান যিনি বাস্তবে সাহায্য করতে পারবেন। যদি ছোট ভাইবোনের নিরাপত্তাও ঝুঁকিতে থাকে, সেটাও চুপ করে থাকার বিষয় নয়। মা বাবার প্রতি সম্মান ইসলামের শিক্ষা, কিন্তু ইসলাম আপনাকে এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে না যেখানে বাস্তব ক্ষতির আশঙ্কা আছে এবং সাহায্য নেওয়ার সুযোগও আছে। আবার সাধারণ রাগারাগি আর গুরুতর নির্যাতনকেও এক করে দেখা ঠিক নয়। দুটোকে আলাদা করে বুঝতে হবে।

ঝগড়ার পরে আমাদের আরেক ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়। আমরা কথা বন্ধ করে দিই। একদিন, দুইদিন, কখনো সপ্তাহ। সামনে পড়লে মুখ ঘুরিয়ে নিই। মা ডাকলে উত্তর দিই না। বাবা কিছু জিজ্ঞেস করলে অন্য কাউকে দিয়ে বলাই। মনে হয়, “ওরা বুঝুক আমার কত কষ্ট হয়েছে।” কিন্তু এই নীরবতাও কখনো প্রতিশোধ হয়ে যায়। একটু সময় নিয়ে শান্ত হওয়া দরকার হতে পারে, কিন্তু কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দিনের পর দিন সম্পর্ক বন্ধ রাখা অন্য জিনিস। আপনি কথা বলার মতো অবস্থায় না থাকলে জানিয়ে দিন, “আমার মনটা এখনও খারাপ। একটু সময় লাগবে, কিন্তু আমি কথা বন্ধ করে রাখতে চাই না।” এতটুকু বললেও সম্পর্কের দরজাটা বন্ধ হয় না। কারণ অনেক সময় দুজন মানুষই অপেক্ষা করেন অন্যজন আগে কথা বলুক। কেউ এগোয় না। একটা ছোট ঝগড়া ধীরে ধীরে বিশাল দূরত্ব হয়ে যায়।

আপনি যদি এই ধরনের পরিস্থিতিতে বারবার পড়েন, ঝগড়ার পরে শুধু “ওরা কেন এমন?” ভাববেন না। নিজের pattern টাও দেখুন। কোন কথায় আপনার মাথা সবচেয়ে দ্রুত গরম হয়? তুলনা? ক্যারিয়ার? টাকা? বিয়ে? বন্ধুবান্ধব? পুরোনো ব্যর্থতা? কোন সময় আপনি এমন কথা বলে ফেলেন যেটার জন্য পরে অনুতপ্ত হন? আপনি কি সবসময় শেষ কথা বলতে চান? নাকি এতদিন চুপ থাকতে থাকতে একদিন বিস্ফোরিত হন? নিজের এই জায়গাগুলো চিনে ফেললে পরের ঝগড়ায় আপনি কিছুটা আগে নিজেকে ধরতে পারবেন। একইভাবে শান্ত সময়ে মা বাবাকেও বলা যায়, “এই বিষয়টা নিয়ে কথা হলেই আমাদের ঝগড়া হয়। আমরা কি অন্যভাবে কথা বলার চেষ্টা করতে পারি?” সব পরিবার এই কথায় সঙ্গে সঙ্গে বদলাবে না, কিন্তু সম্পর্কের নতুন অভ্যাস কখনো কখনো একজনের আচরণ বদলানো দিয়েই শুরু হয়।

মনে রাখবেন, আপনার মা বাবা রেগে গেলে তাঁদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব পুরোপুরি আপনার না। আপনি সবসময় এমন perfect কথা খুঁজে পাবেন না যা বললেই তাঁরা শান্ত হয়ে যাবেন। কখনো আপনি খুব সম্মানের সঙ্গে কথা বলেও কঠিন কথা শুনবেন। তখন নিজের সব দোষ খুঁজে বসবেন না। আপনার দায়িত্ব নিজের সীমার মধ্যে। আপনি চেষ্টা করবেন বেয়াদবি না করতে, মিথ্যা না বলতে, অপমানের জবাবে অপমান না করতে, সম্ভব হলে পরিস্থিতি ঠান্ডা করতে। আর পরে প্রয়োজন হলে নিজের কষ্টটা স্পষ্ট করে বলতে। তাঁদের আচরণের জন্য তাঁরা আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবেন, আপনার আচরণের জন্য আপনি করবেন।

ঝগড়ার মুহূর্তে হয়তো আপনার মনে হবে, “আমি এখনই কিছু না বললে আমাকে দুর্বল ভাববে।” কিন্তু অনেক সময় পাঁচ সেকেন্ডের একটা চুপ থাকা, একটা কড়া বাক্য আটকে দেওয়া, ঘর থেকে বের হওয়ার আগে স্বরটা নামিয়ে বলা, “পরে কথা বলি”, এগুলো দুর্বলতার কাজ নয়। এগুলো সেই মানুষটার কাজ, যে বুঝেছে রাগের পাঁচ মিনিটকে দিয়ে সে বিশ বছরের সম্পর্কের ক্ষতি করতে চায় না।

সব কথা সেই মুহূর্তে বলতে হয় না। কিছু কথা বাঁচিয়ে রাখাই ভালো, যাতে পরে শান্ত হয়ে সত্যিকারের কথাটা বলা যায়।

অধ্যায় ০৪

মা বাবা ভুল করলে কীভাবে বলব? সম্মান করতে গিয়ে কি সবকিছু চুপ করে সহ্য করতে হবে?

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> সম্পাদকীয় সীমা: ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতার সঙ্গে কথোপকথনের সূত্র মারইয়াম ১৯:৪২ থেকে ৪৭। মূল লেখার উদাহরণ বাস্তব নির্যাতন সহ্য করার বাধ্যবাধকতা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

কখনো সমস্যা ঝগড়ার সময় না, ঝগড়া শেষ হওয়ার পর শুরু হয়। আপনি ঘরে এসে বারবার ভাবছেন, “আমি জানি আব্বু ভুল বলেছেন। কিন্তু এখন তাঁকে সেটা বলব কীভাবে?” অথবা মা এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেটার কারণে আপনি সত্যিই কষ্ট পাচ্ছেন। আপনি মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন। কারণ কিছু বললেই যদি বলা হয়, “এখন তুমি আমাদের ভুল ধরতে শিখেছ?” আবার চুপ থাকলেও ভেতরে ক্ষোভ জমছে। বাইরে থেকে সব স্বাভাবিক, কিন্তু মায়ের সঙ্গে আগের মতো বসতে ইচ্ছে করে না। বাবার সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না। তাঁরা হয়তো বুঝতেও পারছেন না, একটা নির্দিষ্ট ঘটনার পর থেকে সন্তানটা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।

আমাদের অনেকের মাথায় মা বাবাকে সম্মান করার একটা এমন ধারণা তৈরি হয়েছে, যেখানে মনে হয় তাঁদের ভুল দেখলেও সেটা বলা যাবে না। তাঁরা কোনো কথা বলে কষ্ট দিলে চুপ। কোনো বিষয়ে অন্যায় করলে চুপ। আপনার কথা ভুল বুঝলে চুপ। কারণ কথা বললেই যদি বেয়াদবি হয়ে যায়? কিন্তু ইসলাম মা বাবাকে সম্মান করতে বলেছে,

তাঁদের মানুষ হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে এমন কথা বলেনি। মানুষ হিসেবে তাঁদেরও রাগ হয়, ভুল বোঝাবুঝি হয়, সিদ্ধান্তে ভুল হতে পারে, কখনো সন্তানের প্রতি অবিচারও হয়ে যেতে পারে। কুরআনে এমনকি মা বাবা সন্তানকে শিরকের দিকে চাপ দিলে সেই কথা না মানার নির্দেশ আছে, তবু তাঁদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ বজায় রাখতে বলা হয়েছে। সূরা লুকমান, ৩১:১৫। এর মানে খুব গভীর। সম্মান রাখা আর ভুলকে সঠিক বলা এক কথা নয়।

কিন্তু এখানেই সন্তানের জন্য কঠিন জায়গা আসে। মা বাবার ভুল ধরতে গিয়ে অনেক সময় আমরা ভুলটাকে আর আলাদা রাখি না, মানুষটাকেই বিচার করতে শুরু করি। ধরুন মা আপনার ভাইকে একটা সুযোগ দিলেন, আপনাকে দিলেন না। আপনি কষ্ট পেলেন। শান্তভাবে বলতে পারতেন, “আম্মু, এই জায়গাটায় আমার একটু কষ্ট হয়েছে। আমার মনে হয়েছে আমার সঙ্গে একইভাবে দেখা হয়নি।” কিন্তু রাগ জমতে জমতে একদিন বের হলো, “আপনি তো সবসময় ওকেই বেশি ভালোবাসেন। আমার জন্য আপনার কোনো মায়া নেই।” এখন কথাটা আর ওই নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের মধ্যে থাকল না। আপনি মায়ের পুরো ভালোবাসাকে প্রশ্নের মধ্যে নিয়ে এলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের পক্ষ নেওয়া শুরু করবেন। হয়তো বলবেন, “তোমার জন্য এত কিছু করলাম, আর আজ বলছ আমি তোমাকে ভালোবাসি না?” আপনার আসল কষ্টটা তখন হারিয়ে গেল।

বাবার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা হয়। তিনি হয়তো আপনার ক্যারিয়ার নিয়ে এমন একটা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চাইছেন যেটা আপনার কাছে বাস্তবসম্মত মনে হচ্ছে না। আপনি যদি বলেন, “আব্বু, আপনি আমার জীবনটাই নষ্ট করে দিচ্ছেন”, তিনি সম্ভবত আর আপনার ক্যারিয়ারের যুক্তি শুনবেন না। তাঁর কানে প্রথমে পৌঁছাবে, তাঁর সন্তান তাঁকে নিজের জীবন নষ্ট করার মানুষ বলছে। অথচ বলা যেত, “আব্বু, আমি জানি আপনি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে আমি খুব ভয় পাচ্ছি। কারণ আমাকে যদি এমন একটা পথে যেতে হয় যেটা আমি ধরে রাখতে পারব না, পরে

সমস্যাটা আরও বড় হতে পারে। আমি চাই আপনি আমার পরিকল্পনাটাও একবার শুনুন।” এখানে নিজের অবস্থান একটুও ছোট করা হয়নি। শুধু মানুষটাকে আঘাত না করে সমস্যাটাকে সামনে রাখা হয়েছে।

কুরআনে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সঙ্গে তাঁর পিতার কথোপকথনটা এই জায়গায় খুব সুন্দর শিক্ষা দেয়। তাঁর পিতা শুধু সাধারণ কোনো ভুলের মধ্যে ছিলেন না, তিনি শিরকের মধ্যে ছিলেন। তবুও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁকে সম্বোধন করেছেন, “হে আমার প্রিয় পিতা” বলে। তিনি ভুলকে ভুল বলেছেন, তাঁর বিশ্বাসকে সমর্থন করেননি, কিন্তু কথার ভেতর থেকে পিতার সম্মান তুলে নেননি। সূরা মারইয়াম, ১৯:৪২ থেকে ৪৭। আমাদের পারিবারিক মতের অমিল তো অধিকাংশ সময় এর চেয়ে অনেক ছোট বিষয়ে। তাই নিজের কাছে কখনো প্রশ্ন করা দরকার, “আমি কি ভুলটার বিরোধিতা করছি, নাকি রাগের কারণে মানুষটাকেই ছোট করে দিচ্ছি?”

মা বাবার ভুল বলার সবচেয়ে ভালো সময়ও সাধারণত ভুলটা হওয়ার মুহূর্ত না। ধরুন অতিথিদের সামনে বাবা আপনাকে অন্যায়ভাবে বকেছেন। আপনার ভেতরটা জ্বলছে। সবার সামনেই বলে দিতে ইচ্ছে করছে, “আপনি যা বলছেন সেটা সত্য না।” কখনো প্রয়োজন হলে ভুল তথ্য পরিষ্কার করা লাগতেই পারে, কিন্তু অধিকাংশ পারিবারিক বিষয়ে মানুষজন চলে যাওয়ার পর আলাদা করে বলা অনেক বেশি ফলদায়ক। কারণ মানুষের সামনে কাউকে ভুল প্রমাণ করলে বিষয়টা দ্রুত আত্মসম্মানের লড়াই হয়ে যায়। পরে বলতে পারেন, “আব্বু, আজকে সবার সামনে যে কথাটা হলো সেটা নিয়ে আমি একটু বলতে চাই। আমি তখন উত্তর দিইনি, কারণ সবার সামনে কথা বাড়াতে চাইনি। কিন্তু ঘটনাটা আসলে একটু অন্যরকম ছিল।” একজন বাবা হয়তো প্রথমবারেই মানবেন না, কিন্তু অন্তত আপনি এমন পরিবেশ তৈরি করলেন যেখানে তাঁর জন্য নিজের অবস্থান বদলানো সম্ভব।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভুল বলার সময় যতটা সম্ভব নির্দিষ্ট ঘটনা নিয়ে কথা বলা। “আপনি আমাকে সম্মান করেন না” খুব বড় অভিযোগ। কিন্তু “আজকে আত্মীয়দের সামনে আমার বেতনের কথা যেভাবে বলা হলো, সেটা আমার খুব

অস্বস্তিকর লেগেছে” অনেক পরিষ্কার। “আপনি আমাকে কোনো স্বাধীনতা দেন না” বললে তর্ক শুরু হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু “আমি কোথাও যাওয়ার কথা বললে যদি কারণ না শুনেই না বলা হয়, তখন আমার মনে হয় আমার ওপর বিশ্বাস নেই” বললে সমস্যাটা বোঝা সহজ হয়। একজন মানুষ পুরো চরিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনলে নিজের প্রতিরক্ষা শুরু করেন। একটি নির্দিষ্ট আচরণের কথা শুনলে অন্তত সেটা নিয়ে ভাবার সুযোগ থাকে।

কিন্তু সব মা বাবা এই ভাষাও সহজে নেবেন না। আপনি খুব শান্তভাবে বললেন, তারপরও মা বললেন, “আমাকেই এখন শিক্ষা দেবে?” বাবা বললেন, “এত বড় হয়েছ যে আমার বিচার করবে?” তখন আবারও আপনার সামনে পরীক্ষা। আপনি কি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, “দেখলেন, আপনাদের সঙ্গে কথাই বলা যায় না?” নাকি একটু থামবেন? বলা যায়, “আমি আপনাকে শেখাতে আসিনি। আমি শুধু আমার কষ্টটা বলতে চেয়েছি।” তারপর যদি দেখেন তিনি আর শুনতে প্রস্তুত নন, সেদিনের জন্য থামুন। সব কথা একই দিনে শেষ করতে হবে না। কোনো কোনো মা বাবা প্রথমবার সন্তানের কাছ থেকে এমন কথা শুনে defensive হয়ে যান, পরে একা থাকলে ভাবেন। আপনি হয়তো তাঁর মুখ থেকে কখনো শুনবেন না, “তুমি ঠিক বলেছিলে”, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর দেখবেন ওই আচরণটা কমে গেছে। সব পরিবর্তনের সঙ্গে স্বীকারোক্তি আসে না।

তবে চুপ থাকারও একটা সীমা আছে। ধরুন বছরের পর বছর একটা নির্দিষ্ট আচরণ আপনাকে ভেতর থেকে ভেঙে দিচ্ছে। বারবার অপমান করা হচ্ছে, ভাইবোনের মধ্যে স্পষ্ট অন্যায় করা হচ্ছে, আপনার উপার্জনের ওপর এমন চাপ দেওয়া হচ্ছে যা আপনি বহন করতে পারছেন না, আপনার ব্যক্তিগত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এমন হস্তক্ষেপ হচ্ছে যার কারণে সংসার বা মানসিক স্থিতি নষ্ট হচ্ছে। তখন শুধু “মা বাবা কষ্ট পাবেন” ভেবে সবকিছু জমিয়ে রাখা সবসময় বুদ্ধিমানের কাজ নয়। জমে থাকা কষ্ট একদিন সুন্দর ভাষায় বের হয় না। অনেক সময় দশ বছর চুপ থাকা মানুষটা এগারোতম বছরে এমনভাবে বিস্ফোরিত হয় যে তখন আর কেউ আসল সমস্যাটাই দেখতে পারে না। তাই

ছোট থাকতেই কথা বলা ভালো। সম্মান রেখে বলা যায়, “এই বিষয়টা নিয়ে আমার আপনার সঙ্গে একটা সীমা ঠিক করা দরকার। আমি চাই না আমাদের সম্পর্ক খারাপ হোক, কিন্তু বর্তমানভাবে চললে আমার ভেতরে অনেক কষ্ট জমছে।”

সীমা ঠিক করা মানেই সম্পর্ক কেটে দেওয়া নয়। আমাদের সমাজে boundary কথাটা কখনো এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যেন যার সঙ্গে সমস্যা তার সঙ্গে যোগাযোগ কমিয়ে দিলেই সব সমাধান। আবার উল্টো দিকে কেউ মনে করেন মা বাবার ক্ষেত্রে কোনো সীমাই থাকতে পারে না। বাস্তবতা এত সরল না। বিবাহিত সন্তানের সংসারের ব্যক্তিগত বিষয়, উপার্জনের সামর্থ্য, ব্যক্তিগত তথ্য, সময়, স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক, সন্তান পালনের কিছু সিদ্ধান্ত, এসব জায়গায় পরিস্থিতিভেদে সীমা দরকার হতে পারে। কিন্তু সীমা যেন প্রতিশোধ না হয়। “আপনি আমার কথা শোনেননি, এখন আমিও আপনাকে কিছু বলব না” এটা সীমা না, এটা কষ্টের জবাব। সীমা হলো, “এই বিষয়টা নিয়ে আপনার পরামর্শ আমি অবশ্যই শুনব, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমার পরিস্থিতিটাও বিবেচনা করতে হবে।” কোথাও শরয়ি অধিকার ও দায়িত্ব জড়িত থাকলে নিজের নির্দিষ্ট অবস্থা একজন যোগ্য আলেমকে জানিয়ে পরামর্শ নেওয়া ভালো।

কখনো আবার আপনি নিজে বলতে পারছেন না। বাবার সামনে গেলেই ভয় লাগে, কথা গুলিয়ে যায়। মা আপনার কথা শুরু হতেই কেঁদে ফেলেন, তারপর আপনি অপরাধবোধে আর কিছু বলতে পারেন না। তখন বিশ্বস্ত তৃতীয় কাউকে নেওয়া দুর্বলতা নয়। পরিবারের এমন একজন বড় মানুষ যাঁকে তাঁরা সম্মান করেন, কোনো দায়িত্বশীল আলেম, কাউন্সেলর বা বিচক্ষণ আত্মীয় মাঝখানে থাকলে অনেক বন্ধ কথাও খুলতে পারে। তবে এমন মানুষ বেছে নিন যিনি আগুনে তেল ঢালবেন না। যিনি গিয়ে বলবেন না, “আপনার ছেলে বলেছে আপনি খুব খারাপ বাবা।” বরং বলতে পারবেন, “ও আপনাদের সম্মান করে, কিন্তু এই জায়গাটায় ও খুব কষ্ট পাচ্ছে। আমরা কি একটু শুনতে পারি ও কী বলতে চায়?” মধ্যস্থতার উদ্দেশ্য কাউকে দোষী বানানো নয়, দুপক্ষকে আবার কথা বলানো।

আর মা বাবারও একটা কথা ভাবা দরকার। সন্তান যদি খুব ভয়ে ভয়ে এসে বলে, “আমি একটা কথা বলব, রাগ করবেন না”, এই বাক্যটাকে হালকা করে দেখবেন না। হতে পারে সে বহুদিন ধরে কথাটা বলার সাহস জমাচ্ছে। সে যদি বলে আপনার কোনো আচরণে কষ্ট পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে “আমি তোমার জন্য কী করিনি?” বললে তার কষ্টের উত্তর হয় না। আপনি তার জন্য হাজারটা ভালো কাজ করেছেন, এটা সত্য। একই সঙ্গে একটা জায়গায় তাকে কষ্টও দিয়ে থাকতে পারেন, এটাও সত্য হতে পারে। সন্তানের অভিযোগ শোনা মানে নিজের সমস্ত ত্যাগ অস্বীকার করা নয়। কখনো শুধু এতটুকু বলা, “আমি বুঝিনি কথাটা তোকে এতটা কষ্ট দিয়েছে”, সম্পর্কের মধ্যে বহুদিনের জমে থাকা বরফ গলিয়ে দিতে পারে।

সন্তানেরও নিজের ভুল দেখার সাহস থাকতে হবে। আপনি যদি মায়ের ভুল নিয়ে কথা বলেন, আর তিনি বলেন, “তুইও সেদিন আমাকে খুব খারাপভাবে বলেছিলি”, সঙ্গে সঙ্গে বলবেন না, “কিন্তু আপনি আগে শুরু করেছিলেন।” তাঁর কথাটা সত্য হলে স্বীকার করুন। “হ্যাঁ, আমি ওইভাবে বলেছি, সেটা আমার ভুল ছিল। আমি এজন্য দুঃখিত। তবে আমি যে বিষয়টা বলতে এসেছি, সেটাও কি একটু শুনবেন?” নিজের ভুল স্বীকার করলে আপনার মূল অভিযোগ বাতিল হয়ে যায় না। বরং মানুষ বুঝতে পারেন আপনি বিচার করতে আসেননি, সমাধান করতে এসেছেন।

একসময় আমাদের বড় হতে হয় এমন একটা জায়গায়, যেখানে মা বাবাকে শুধু “যাঁরা সব জানেন” হিসেবে না দেখে মানুষ হিসেবেও দেখতে শিখি। তাঁদেরও শৈশব ছিল, ভয় ছিল, না পাওয়া ছিল, ভুল শেখা ছিল। কেউ হয়তো নিজের বাবার কাছ থেকে কঠিন ভাষাই পেয়েছেন, তাই সন্তানকে ভালোবাসেন অথচ কোমলভাবে কথা বলতে শেখেননি। কেউ দারিদ্র্য দেখে বড় হয়েছেন, তাই সন্তানের ক্যারিয়ারের প্রতিটি সিদ্ধান্তে অতিরিক্ত ভয় পান। কেউ সমাজের কথা এত বেশি শুনেছেন যে সন্তানের সুখের আগে “মানুষ কী বলবে” চলে আসে। এই পেছনের গল্পগুলো বুঝলে তাঁদের ভুল ঠিক হয়ে

যায় না, কিন্তু আপনার ভেতরের ঘৃণাটা কখনো একটু নরম হয়। আপনি বুঝতে পারেন, “মানুষটা হয়তো আমাকে কষ্ট দিতে চায়নি, কিন্তু যেভাবে শিখেছে সেভাবেই করছে।” তখন আপনি শুধু রাগ না করে পরিবর্তনের পথও খুঁজতে পারেন।

মা বাবাকে সম্মান করা মানে তাঁদের সামনে নিজের সত্য হারিয়ে ফেলা নয়। আবার নিজের সত্য বলা মানে তাঁদের সম্মান কেড়ে নেওয়াও নয়। মাঝের এই পথটাই কঠিন। এখানে কখনো কথা বলতে হয়, কখনো থামতে হয়, কখনো আবার কয়েকদিন পরে ফিরে আসতে হয়। কোনো কোনো বিষয়ে কাউকে সঙ্গে নিতে হয়। আর কোনো কোনো বিষয় আল্লাহর কাছে ছেড়ে দিয়ে মেনে নিতে হয় যে এই মানুষটা হয়তো আমার আশা অনুযায়ী কখনোই বদলাবে না।

সব সম্পর্কের সব সমস্যা ঠিক হয় না। কিন্তু অনেক সম্পর্কের দূরত্ব কমে যায় যখন একজন মানুষ অভিযোগের ভাষা ছেড়ে সত্যের ভাষায় কথা বলতে শেখে। তাই পরেরবার মা বা বাবার কোনো আচরণে খুব কষ্ট পেলে প্রথমেই “আপনি ভুল” বলতে যাবেন না। একটু সময় নিয়ে ভাবুন, আসলে কোন জায়গাটা আপনাকে কষ্ট দিয়েছে। তারপর মানুষটাকে নয়, সেই জায়গাটাকে নিয়ে কথা বলুন।

কারণ মা বাবার ভুল দেখে চুপ করে থাকা সবসময় আদব নয়। আবার ভুল বলতে গিয়ে তাঁদের হৃদয় ভেঙে দেওয়া সাহসও নয়। আসল সৌন্দর্য হলো, সত্যটাও বলা এবং সম্পর্কের সম্মানটাও যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে রাখা।

অধ্যায় ০৫

যখন মনে হয়, “আমার পরিবারই আমাকে সামনে এগোতে দেয় না”

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

আপনার বয়স হয়তো বাইশ, পঁচিশ, ত্রিশ। মাথার ভেতর অনেক পরিকল্পনা। একটা বিষয়ে পড়তে চান, কিন্তু বাবা চান অন্য কিছু। আপনি চাকরি বদলাতে চান, মা ভয় পান। ব্যবসা করতে চান, বাসা থেকে শুনতে হয়, “এসব করে লাভ নেই, একটা নিশ্চিত চাকরি করো।” হয়তো বিদেশে পড়ার সুযোগ এসেছে, কিন্তু পরিবার রাজি না। আবার কারও সমস্যা অন্যরকম। সে কিছুই ঠিক করতে পারছে না, কারণ প্রতিটি সিদ্ধান্তের আগে তার মাথায় আসে, “বাসায় কী বলবে?” কয়েক বছর যেতে যেতে তার মনে একটা কথা শক্ত হয়ে বসে যায়, “আমার জীবনে আমি পিছিয়ে আছি শুধু আমার পরিবারের জন্য।” বাইরে বন্ধুদের এগোতে দেখে তখন কষ্টটা আরও বাড়ে। কেউ চাকরি পেয়েছে, কেউ ব্যবসা দাঁড় করিয়েছে, কেউ নিজের পছন্দের বিষয়ে পড়ছে। আর আপনার মনে হয়, “আমিও পারতাম। আমাকে যদি একটু স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া হতো, আজ আমার জীবন অন্যরকম হতো।”

এই অনুভূতিটাকে হালকা করে দেখলে ভুল হবে। দীর্ঘদিন নিজের সিদ্ধান্তে কোনো জায়গা না পাওয়া একজন মানুষকে সত্যিই অসহায় করে দিতে পারে। বিশেষ করে যখন প্রত্যেকবার চেষ্টা করার আগেই শুনতে হয়, “তুমি পারবে না”, “এত বড় স্বপ্ন দেখে লাভ কী?”, “আমরা যা বলছি সেটাই করো”, তখন ধীরে ধীরে নিজের ওপর বিশ্বাসও কমতে শুরু করে। একসময় মানুষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলে। ছোট একটা কাজের ক্ষেত্রেও মনে হয়, “আমি যদি ভুল করি?” তখন মা বাবার বাধা শুধু বাইরে থাকে না, সেটা মাথার ভেতরেও ঢুকে যায়। তাঁরা কিছু না বললেও আপনি নিজেই নিজেকে থামাতে শুরু করেন। আবার ঠিক উল্টো প্রতিক্রিয়াও হয়। কেউ এতদিন

নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকতে থাকতে একসময় ভাবে, “এখন থেকে কারও কথা শুনব না।” তারপর ভালো পরামর্শও প্রত্যাখ্যান করে শুধু প্রমাণ করার জন্য যে নিজের জীবন সে নিজেই চালাবে। দুই অবস্থাতেই ক্ষতি হয়।

তবে “আমার পরিবার আমাকে এগোতে দেয় না” কথাটা বলার আগে নিজের অবস্থাটা একটু খুলে দেখতে হয়। কারণ সব পারিবারিক বাধা একই রকম নয়। কখনো মা বাবার ভয় বাস্তব কারণের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। আপনি যে ব্যবসায় সমস্ত সঞ্চয় ঢালতে চান, সেটা নিয়ে হয়তো আপনার পরিষ্কার পরিকল্পনাই নেই। বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কিন্তু খরচ, পড়াশোনা, থাকার ব্যবস্থা কিছুই ঠিক করেননি। চাকরি ছেড়ে নতুন কিছু করতে চান, কিন্তু তিন মাস পরে আয় না হলে কী করবেন তার উত্তর নেই। তখন বাবা বললেন, “না”, আর আপনার মনে হলো তিনি আপনার স্বপ্নের শত্রু। অথচ হতে পারে তিনি স্বপ্নের বিরুদ্ধে নন, তিনি আপনার পরিকল্পনার ফাঁকগুলো দেখছেন। আবার এমনও পরিবার আছে যেখানে পরিকল্পনা যত ভালোই হোক, সন্তানকে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়াই হয় না। কারণ তাঁদের ভয়, সন্তান ভুল করলে কী হবে, আত্মীয়রা কী বলবে, সমাজ কী বলবে, অথবা তাঁদের নিজের কল্পনার বাইরে সন্তান অন্য জীবন বেছে নিলে সেটা তাঁরা মেনে নিতে পারেন না। এই দুই পরিস্থিতির সমাধান এক হবে না।

অনেক মা বাবা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করতে চান খারাপবেসে নয়, ভয় থেকে। বাবা হয়তো সারাজীবন অর্থকষ্ট দেখেছেন। তাই তাঁর কাছে “নিরাপদ চাকরি” শুধু একটা চাকরি নয়, নিরাপত্তার আরেক নাম। আপনি ব্যবসার কথা বললে তিনি আপনার সম্ভাবনা দেখার আগে নিজের পুরোনো অভাবটা দেখতে পান। মা হয়তো জীবনে অনেক অনিশ্চয়তা সহ্য করেছেন। তাই আপনি অন্য শহরে বা অন্য দেশে যেতে চাইলে তাঁর মাথায় আগে বিপদগুলো আসে। আপনি শুনছেন, “যেও না।” তাঁর ভেতরের কথাটা হয়তো, “তোমার কিছু হলে আমি কী করব?” সমস্যা হয় যখন এই ভয় কথায় বের হয় নিয়ন্ত্রণ হিসেবে। সন্তান তখন ভালোবাসা শুনতে পায় না, শুধু বাধা শুনতে পায়। আবার মা বাবাও সন্তানের পরিকল্পনাকে অনেক সময় স্বাধীনতার দাবি হিসেবে শুনে ফেলেন, দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত হিসেবে না। একই কথার ভেতরে দুই পক্ষ দুই জিনিস শুনছে।

তাই ক্যারিয়ার বা ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলার আগে শুধু আবেগ নিয়ে বসলে অনেক সময় কাজ হয় না। “আমি এটা খুব চাই” আপনার জন্য শক্ত কারণ হতে পারে, কিন্তু বাবা মায়ের কাছে সেটা যথেষ্ট নাও হতে পারে। তাঁদের দেখান আপনি ভেবেছেন। কী করতে চান, কেন করতে চান, কত সময় লাগবে, খরচ কত, ঝুঁকি কোথায়, ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় পথ কী, এগুলো পরিষ্কার করুন। ধরুন আপনি চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করতে চান। শুধু “আমার চাকরি ভালো লাগে না” বললে তাঁরা ভয় পাবেন। কিন্তু যদি বলেন, “আমি ছয় মাসের খরচ আলাদা রেখেছি, প্রথমে চাকরির পাশাপাশি শুরু করব, তিন মাস ফল দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেব”, তখন কথাটা অন্যরকম শোনায়। অনেক সময় সন্তান বলে, “আমাকে বিশ্বাস করেন না কেন?” অথচ মা বাবা বিশ্বাস করার মতো পরিকল্পনাটা কখনো দেখতেই পাননি।

একই সঙ্গে একটা কঠিন সত্যও মানতে হবে। আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পরিকল্পনা দেখালেও মা বাবা সব সিদ্ধান্তে রাজি হবেন, এমন নিশ্চয়তা নেই। তখন আপনার ভেতরে প্রশ্ন আসবে, “তাহলে কি আমার জীবনটা আমার না?” প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষের জীবনের অনেক সিদ্ধান্তে তার নিজের দায়িত্বও আছে। নিজের সামর্থ্য, দ্বীন, ভবিষ্যৎ, দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্তের ফল নিয়ে তাকেই আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। কিন্তু এই কথার অর্থ মা বাবার মতামত অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল না। তাঁদের অভিজ্ঞতা শুনবেন, ভয়টা বোঝার চেষ্টা করবেন, পরামর্শ নেবেন, ইস্তিখারা করবেন, বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ মানুষের মত নেবেন। তারপরও যদি কোনো বৈধ বিষয়ে আপনার কাছে অন্য পথটাই ভালো মনে হয়, তখন দ্বিমত হতে পারে। সেই দ্বিমতকে যুদ্ধ বানানো জরুরি নয়। আপনি বলতে পারেন, “আব্বু, আমি আপনার কথাটা হালকাভাবে নিচ্ছি না। অনেক ভেবেছি। আমি জানি আপনি অন্য কিছু চান, কিন্তু এই সিদ্ধান্তটার দায়িত্ব আমি নিতে চাই। ভুল হলে তার দায়ও আমি নেব। আমি শুধু চাই আপনি আমার জন্য দু‘আ করেন।”

তবে নিজের সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নেওয়া কথায় সহজ, বাস্তবে কঠিন। আমরা অনেক সময় স্বাধীনতা চাই, কিন্তু সিদ্ধান্ত ভুল হলে আবার পুরো দায় পরিবারকে দিই। নিজের পছন্দের subject পড়লাম, পরে ভালো লাগল না, বললাম, “আমাকে কেউ guide করেনি।” নিজের ইচ্ছায় ব্যবসা করলাম, ক্ষতি হলো, বললাম, “বাবা support করলে হতো।” নিজের সিদ্ধান্তের অধিকার চাইলে তার ফল বহনের মানসিক প্রস্তুতিও দরকার। আর মা বাবার কথায় কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে যদি সেটা ভালো না হয়, সেখানেও সারাজীবন শুধু তাঁদের দোষ দিয়ে আটকে থাকলে আপনারই জীবন থেমে থাকবে। হয়তো সত্যিই আপনার জীবনের কিছু বছর অন্যের সিদ্ধান্তে চলে গেছে। হয়তো এমন একটা সুযোগও হারিয়েছেন যা আর ফিরবে না। সেই কষ্টকে ছোট করার কিছু নেই। কিন্তু একটা সময় এসে প্রশ্নটা বদলাতে হয়। “আমার সঙ্গে কী হয়েছে?” থেকে “এখন আমার হাতে কী আছে?” এই জায়গায় না গেলে অতীতের অন্যায় ভবিষ্যতেরও মালিক হয়ে যায়।

ধরুন আপনার বয়স এখন আটাশ। আপনার মনে হয়, “বাবার জন্য আমার পাঁচ বছর নষ্ট হয়েছে।” হতে পারে এই অভিযোগের বাস্তব ভিত্তি আছে। কিন্তু এখন যদি আরও পাঁচ বছর শুধু এই কথাই ভাবেন, তাহলে প্রথম পাঁচ বছরের জন্য হয়তো অন্য কেউ দায়ী ছিল, পরের পাঁচ বছরের দায় ধীরে ধীরে আপনার ওপরও আসবে। জীবনের সব দরজা একই বয়সে খোলা থাকে না, এটা সত্য। আবার অনেক দরজা আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক পরে গিয়েও খোলে, এটাও সত্য। নতুন skill শেখা যায়, পড়াশোনা আবার শুরু করা যায়, চাকরি বদলানো যায়, ছোট করে ব্যবসা শুরু করা যায়, নিজের আর্থিক অবস্থান ধীরে ধীরে শক্ত করা যায়। প্রথম সুযোগটি হারানো মানেই আপনার জীবনের শেষ সুযোগ হারানো নয়। কিন্তু সামনে এগোতে গেলে প্রতিদিন নিজের ক্ষতের কাছে ফিরে গিয়ে প্রমাণ করতে থাকলে যে “আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে”, আপনার শক্তিটাই সেখানে শেষ হয়ে যাবে।

এখানে মা বাবার জন্যও কিছু কথা আছে। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা আপনার দায়িত্ববোধের অংশ হতে পারে, কিন্তু তার পুরো জীবন নিজের ভয় দিয়ে চালানো ভালোবাসার একমাত্র রূপ নয়। আপনার ছেলে যে বিষয়ে ভালো, আপনি হয়তো সেটা বুঝছেন না। মেয়েটা যে কাজ করতে চায়, সেটা আপনার সময়ে পরিচিত পেশা ছিল না বলে সেটাকে গুরুত্বহীন মনে হতে পারে। আপনার কাছে সরকারি চাকরি নিরাপত্তা, তার কাছে হয়তো অন্য পেশায় দক্ষতা ও সম্ভাবনা আছে। আপনি অভিজ্ঞ, কিন্তু ভবিষ্যৎ জানেন না। সন্তানও জানে না। তাই তাকে শুধু "আমরা বেশি বুঝি" বলে থামিয়ে না দিয়ে তার প্রস্তুতিটা দেখুন। প্রশ্ন করুন, "তোর পরিকল্পনা কী?" "ব্যর্থ হলে কী করবি?" "আমি কোন জায়গাটা বুঝতে পারছি না, আমাকে বুঝিয়ে বল।" অনেক সন্তান শুধু অনুমতি চায় না, সে চায় তার মা বাবা তার ভেতরের মানুষটাকেও একবার দেখুক।

আর সন্তান যদি এখনও আর্থিকভাবে পুরোপুরি মা বাবার ওপর নির্ভরশীল হয়, তখন বাস্তবতাও মাথায় রাখতে হবে। আপনি এমন সিদ্ধান্ত নিলেন যার সমস্ত খরচ বাবা দেবেন, আবার বলছেন তাঁর কোনো মতামত থাকতে পারবে না, এটা ন্যায্য কথা না। স্বাধীনতার সঙ্গে সামর্থ্যের সম্পর্ক আছে। নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গা বাড়াতে চাইলে নিজের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতাও বাড়াতে হবে। পড়াশোনায় সিরিয়াস হওয়া, আয় শেখা, টাকা ব্যবস্থাপনা জানা, সময়ের মূল্য বোঝা, নিজের কথা রাখার অভ্যাস তৈরি করা, এগুলো মা বাবার বিশ্বাসও বাড়ায়। কিছু পরিবারে সন্তান অভিযোগ করে, "আমাকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দেয় না", অথচ ঘরের সাধারণ একটা দায়িত্বও সে নিয়মিত পালন করে না। মা বাবার ভুল থাকতেই পারে, কিন্তু নিজের অপরিপক্কতাকেও "আমাকে বুঝে না" কথার আড়ালে লুকিয়ে রাখলে সমাধান হবে না।

আরেকটা জায়গায় খুব সতর্ক থাকা দরকার। নিজের বন্ধুদের জীবন দেখে নিজের পরিবারকে বিচার করা। বন্ধুর বাবা তাকে বিদেশে পাঠিয়েছেন, আপনার বাবা পাঠাননি। কারও মা মেয়ের পছন্দের career নিয়ে খুব supportive, আপনার মা নন। কারও পরিবার ব্যবসার জন্য দশ লাখ টাকা দিয়েছে, আপনার পরিবার দিতে পারেনি। বাইরে থেকে আপনি শুধু ফলটা দেখছেন, পুরো ঘরের বাস্তবতা না। কারও পরিবারের টাকা

আছে, আপনার নেই। কারও বাবা ঝুঁকি নিতে পারেন, আপনার বাবা হয়তো পুরো পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। আবার সত্যিই এমনও হতে পারে আপনার পরিবারের সামর্থ্য আছে, কিন্তু তাঁরা অযৌক্তিকভাবে আপনাকে আটকে রাখছেন। তখনও তুলনা সমস্যার সমাধান করে না। “ওর বাবা পারে, আপনি পারেন না কেন?” বললে মানুষের হৃদয় বন্ধ হয়। নিজের প্রয়োজন নিজের বাস্তবতা দিয়ে বলুন।

কখনো পারিবারিক চাপ এত দীর্ঘ হয় যে একজন তরুণ সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে কোনো কিছু করার ইচ্ছা নেই। পড়াশোনায় মন বসে না। চাকরির আবেদন করতে ইচ্ছে করে না। বারবার মনে হয়, “যাই করি শেষ পর্যন্ত তো বাধা আসবে।” এখান থেকে হতাশা তৈরি হতে পারে। তখন শুধু career plan না, নিজের মানসিক অবস্থারও যত্ন দরকার। নিয়মিত ঘুম, শরীরচর্চা, সালাত, দু'আ, এমন বন্ধু যাদের সঙ্গে কথা বলে আপনি আরও হতাশ না হয়ে স্থির হতে পারেন, কোনো trusted mentor, প্রয়োজনে counsellor, এগুলো গুরুত্ব পায়। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে একা মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকলে সমস্যা অনেক বড় মনে হয়। একজন অভিজ্ঞ মানুষ কখনো এমন পথ দেখাতে পারেন যেটা আপনি বা আপনার পরিবার কেউই ভাবেননি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, নিজের জীবন নিয়ে হতাশ হয়ে মা বাবাকে শত্রু বানিয়ে ফেলবেন না। আবার তাঁদের খুশি রাখার নামে নিজের ভেতরে এমন ক্ষোভও জমাবেন না যে কয়েক বছর পর তাঁদের মুখ দেখলেই মনে হবে, “আমার জীবন তোমাদের জন্য নষ্ট হয়েছে।” কথা বলতে হবে আগেই। পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে সময় নিতে হবে। কখনো আপস করতে হবে, কখনো নিজের অবস্থানে থাকতে হবে। কোথাও ধর্মীয় বা পারিবারিক অধিকারের জটিলতা থাকলে যোগ্য আলেম বা বিচক্ষণ কাউকে নিয়ে বসতে হবে। কিন্তু নিজের ভবিষ্যতের পুরো দায়িত্ব হয় মা বাবার হাতে, নয়তো পুরোপুরি তাঁদের বিরুদ্ধে, এই দুইয়ের একটায় যেতে হবে না।

হয়তো আপনার মা বাবা আপনার স্বপ্নটা এখনও বুঝতে পারছেন না। হয়তো তাঁরা কোনোদিন পুরোপুরি বুঝবেনও না। তবু আপনার জীবনের গল্প শুধু এই একটি বাধায় শেষ হয়ে যায়নি। আপনি তাঁদের সম্মান রেখেও নিজের সামর্থ্য বাড়াতে পারেন, পরিকল্পনাকে শক্ত করতে পারেন, ধৈর্য ধরে বোঝাতে পারেন, প্রয়োজন হলে বিকল্প পথ নিতে পারেন। আর যদি অতীতে সত্যিই কিছু হারিয়েও থাকে, আজকের দিনটাকে আবার সেই হারানোর অংশ বানাবেন না।

কখনো পরিবার আমাদের পথ কঠিন করে দেয়। কিন্তু সেই কষ্টকে নিজের পুরো ভবিষ্যতের পরিচয় বানিয়ে দিলে একসময় আমরা নিজেরাই নিজের পথ আটকে ফেলি।

অধ্যায় ০৬

রাগ করে বাসা থেকে বের হয়ে যেতে ইচ্ছে করলে কী করবেন?

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

ঝগড়াটা এতটাই বেড়েছে যে আর ওই ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। বাবা এমন একটা কথা বলেছেন যেটা আপনার মাথার ভেতর বারবার বাজছে। মা হয়তো কাঁদছেন, আবার আপনাকেই দোষ দিচ্ছেন। আপনি নিজের ঘরে গিয়ে ব্যাগে দুটো জামা ঢুকিয়ে ফেললেন। ফোন, চার্জার, ওয়ালেট নিলেন। মনে হচ্ছে, “এই বাসায় আর এক মিনিটও থাকব না। চলে গেলে তখন বুঝবে।” দরজার কাছে এসে হয়তো একবার পেছনে তাকালেনও। কিন্তু রাগ তখন এমন জায়গায় যে মনে হচ্ছে এখন বের হয়ে যাওয়াই একমাত্র উপায়। কোথায় যাবেন, কতদিন থাকবেন, কাল কী করবেন, এসব কিছুই ঠিক করা নেই। শুধু একটা জিনিস খুব পরিষ্কার মনে হচ্ছে, এখানে আর থাকা সম্ভব না।

কখনো আবার ব্যাগও লাগে না। দরজা খুলে বের হয়ে গেলেন। ফোন silent। মা ফোন করছেন, ধরছেন না। বাবা ফোন করলে আরও রাগ হচ্ছে। বন্ধুকে বললেন, “আজকে বাসায় ফিরব না।” প্রথম এক দুই ঘণ্টা অদ্ভুত একটা হালকা অনুভূতিও হতে পারে। মনে হয়, এতক্ষণ যে চাপের মধ্যে ছিলেন সেটা থেকে বের হয়েছেন। কেউ কিছু বলছে না। কারও সামনে জবাব দিতে হচ্ছে না। কিন্তু রাত একটু বাড়লে অন্য অনুভূতি আসতে শুরু করে। এখন কোথায় থাকবেন? সকালে বাসায় ফিরলে কী হবে? মা কি ঘুমিয়েছেন? বাবা কি এখনও রেগে আছেন? নাকি সবাই আপনাকে খুঁজছে? তখন যে সিদ্ধান্তটা সন্ধ্যায় খুব শক্ত মনে হয়েছিল, সেটাই একটু একটু করে ভারী হয়ে যায়।

রাগ করে কিছু সময়ের জন্য জায়গা বদলানো আর রাগের মাথায় ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘোষণা এক জিনিস নয়। আপনি যদি বুঝতে পারেন কয়েক মিনিট সেখানে থাকলে আপনি এমন কিছু বলে ফেলবেন যা বলা উচিত নয়, তাহলে পাশের ঘরে

যাওয়া, একটু বাইরে হাঁটা, মসজিদে গিয়ে বসা, বিশ্বস্ত কারও কাছে কিছু সময় থাকা অনেক সময় পরিস্থিতি শান্ত করতে পারে। কিন্তু যাওয়ার আগে অন্তত জানিয়ে যাওয়া, “আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, শান্ত হয়ে ফিরব”, এই একটি বাক্য অনেক পার্থক্য তৈরি করে। এর বদলে “আজকের পর আমার মুখ দেখবেন না” বলে বের হওয়া শুধু দূরত্ব নেওয়া না, এটা তখন সম্পর্কের ওপর আঘাত হয়ে যায়। আপনি হয়তো কথাটা সত্যি মানেনও না। কিন্তু যে মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুনলেন তাঁর সন্তান বলছে আর কোনোদিন ফিরবে না, তাঁর জন্য সেই রাতটা অন্যরকম হয়ে যায়।

এই জায়গায় অনেক তরুণের মনে একটা কথা আসে, “আমি গেলে অন্তত ওরা বুঝবে আমাকে কত কষ্ট দিয়েছে।” অর্থাৎ চলে যাওয়াটা তখন নিজের শান্তির জন্য থাকে না, হয়ে যায় একটা message। আপনি চান তাঁরা ভয় পান, খোঁজ করেন, কাঁদেন, বুঝতে পারেন আপনার গুরুত্ব। এই অনুভূতিটা খুব মানবিক, কারণ যে মানুষটা নিজেকে শুনতে না পাওয়া মনে করে, সে কখনো কখনো নিজের অনুপস্থিতি দিয়ে কথা বলতে চায়। কিন্তু সমস্যা হলো, এই ভাষা খুব ব্যয়বহুল। আপনার কষ্ট বোঝাতে গিয়ে পুরো পরিবারকে আতঙ্কের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। মা হয়তো ভাবছেন দুর্ঘটনা হলো কি না। বাবা রাগের ভেতরেও থানায়, হাসপাতালে, বন্ধুদের ফোন করছেন। ছোট ভাইবোন বুঝতে পারছে না কী হয়েছে। আপনি যে কথাটা বলতে চেয়েছিলেন, “আমি খুব কষ্ট পেয়েছি”, সেটা হারিয়ে গিয়ে সবাই শুধু একটাই কথা ভাবছে, “সে কোথায়?”

আবার এমনও হয়, কেউ রাগ করে বের হয়ে যায় এবং ফিরে আসার সময় নিজের অহংকার তাকে আটকে দেয়। রাত বারোটা। মন চায় বাসায় ফিরতে। কিন্তু মনে হচ্ছে, “এখন গেলে ভাববে ভয় পেয়ে ফিরে এসেছি।” সকাল হলো। তখন মনে হলো, “এতক্ষণ পর গেলে আরও খারাপ লাগবে।” একদিন দুইদিন হয়ে যায়। তারপর আর সমস্যাটা শুধু ওই ঝগড়া থাকে না। নতুন অভিযোগ যোগ হয়। “ফোন ধরনি কেন?” “আমাদের এই অবস্থায় রেখে গেলে কীভাবে?” “তোমার কারণে আমরা সারারাত ঘুমাইনি।” আপনি তখন ভাবেন, “দেখলেন? কেউ আমার কষ্টের কথা এখনও বলছে

না।” আর মা বাবা ভাবেন, “এত বড় ঘটনা করেও নিজের ভুল বোঝে না।” প্রথম ঝগড়ার সঙ্গে দ্বিতীয় ঝগড়া জুড়ে যায়। একটা দরজা বন্ধ করতে গিয়ে পাঁচটা নতুন দরজা খুলে যায়।

তাই রাগের সময় একটা নিয়ম নিজের জন্য আগে থেকেই ঠিক করে রাখা ভালো। কোনো স্থায়ী সিদ্ধান্ত নেব না যখন আমি খুব রেগে আছি। সম্পর্ক ছিন্ন করব কি না, বাসা ছাড়ব কি না, চাকরি ছেড়ে দেব কি না, বিয়ে ভাঙব কি না, কাউকে জীবনের বাইরে সরিয়ে দেব কি না, এসব সিদ্ধান্ত এমন সময়ের জন্য রাখুন যখন মাথা স্বাভাবিক। রাগের মুহূর্তে আপনার অনুভূতি মিথ্যা না, কিন্তু আপনার বিচার তখন সংকীর্ণ হয়ে যেতে পারে। আপনি শুধু বর্তমান কষ্টটাই দেখেন। গত দশ বছরের ভালো সময়গুলো তখন মনে পড়ে না। আগামী এক সপ্তাহের বাস্তবতাও মাথায় থাকে না। সেই মুহূর্তে মনে হয়, “এটাই শেষ।” কয়েক ঘণ্টা পরে একই ঘটনা আরেকটু অন্যভাবে দেখা যায়।

কেউ হয়তো বলবেন, “কিন্তু আমি যদি বাসায় থাকি, ঝগড়া আরও বাড়ে।” তাহলে দূরত্ব নিন, কিন্তু দূরত্বটাকে শাস্তি বানাবেন না। একটা message দিতে পারেন, “আমি এখন খুব upset। একটু বাইরে যাচ্ছি। চিন্তা করবেন না, আমি নিরাপদ আছি। কিছুক্ষণ পর ফিরব।” সম্ভব হলে কোথায় আছেন অন্তত একজন বিশ্বস্ত মানুষকে জানান। ফোন পুরো বন্ধ করবেন না। যদি মা বারবার ফোন করেন আর কথা বলার অবস্থায় না থাকেন, ছোট করে লিখতে পারেন, “আমি ঠিক আছি। এখন কথা বললে আবার ঝগড়া হবে। একটু পরে কথা বলব।” এতে আপনার সময়ও পাওয়া হলো, পরিবারও অন্ধকারে থাকল না। আপনি যদি প্রাপ্তবয়স্ক হন, তাহলেও যারা আপনাকে ভালোবাসে তারা হঠাৎ আপনার কোনো খোঁজ না পেলে চিন্তা করবে। সেই চিন্তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে শাস্তি হিসেবে ব্যবহার করা সম্পর্ককে আরও কঠিন করে।

কিছু ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রে বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছাটা একদিনের রাগের না। বহুদিন ধরে মনে হচ্ছে এই বাড়িতে তার কোনো জায়গা নেই। প্রতিদিন একই কথা, একই নিয়ন্ত্রণ, একই অপমান। তখন “চলে যাব” চিন্তাটা শুধু আবেগ না, একটা পরিকল্পনা হয়ে উঠতে পারে। এখানে বিষয়টা আলাদা করে দেখতে হবে। আপনি যদি প্রাপ্তবয়স্ক

হন এবং বাস্তব কারণে আলাদা থাকা প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে আলাদা থাকা নিজে থেকেই সম্পর্ক ছিন্ন করা নয়। অনেক পরিবারে দূরত্ব বরং সম্পর্ককে শান্ত করে। কিন্তু সিদ্ধান্তটা যেন প্রস্তুতিহীন পালানো না হয়। কোথায় থাকবেন, আয় কীভাবে হবে, নিরাপত্তা কেমন, দায়িত্ব কীভাবে পালন করবেন, মা বাবার সঙ্গে যোগাযোগ কীভাবে রাখবেন, এগুলো ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। “তোমাদের দেখিয়ে দেব” মন নিয়ে আলাদা হওয়া আর “এভাবে থাকলে সম্পর্ক আরও খারাপ হচ্ছে, তাই সম্মান রেখে কিছুটা আলাদা থাকা দরকার” এই দুই সিদ্ধান্ত বাইরে থেকে একইরকম দেখালেও ভেতরে এক নয়।

আর যদি আপনি এখনও ছোট হন, আর্থিকভাবে পুরোপুরি নির্ভরশীল হন, অথবা কোথায় যাবেন সেই নিরাপদ ব্যবস্থাই না থাকে, তাহলে রাগ করে বের হয়ে যাওয়া আরও ঝুঁকিপূর্ণ। বন্ধুর বাসা আজ রাতের জন্য জায়গা হতে পারে, কিন্তু জীবন চালানোর সমাধান না। অনেক কিশোর বা তরুণ রাগের মাথায় এমন কারও কাছে গিয়ে পড়ে যাকে সে খুব ভালো করে চেনে না। তারপর আরও বড় সমস্যায় পড়ে। নিজের ঘরের কষ্ট থেকে বের হতে গিয়ে এমন জায়গায় পৌঁছানো যায় যেখানে কেউ আপনার দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিতে পারে। তাই যদি সত্যিই বাসার পরিবেশ অসহনীয় লাগে, একজন বিশ্বস্ত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে জানান। আত্মীয়, শিক্ষক, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ, দায়িত্বশীল আলেম, counsellor, এমন কেউ যিনি শুধু “সহ্য করো” বলবেন না, আবার রাগ বাড়িয়েও দেবেন না।

কখনো বাসা থেকে না বেরিয়েও মানুষ সম্পর্ক থেকে বের হয়ে যায়। একই ছাদের নিচে থাকে, কিন্তু কথা বন্ধ। মা কিছু জিজ্ঞেস করলে এক শব্দে উত্তর। বাবার সামনে বসে না। খাওয়ার সময় আলাদা। কোথাও গেলে জানায় না। প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথা নেই। বাইরে থেকে পরিবার আছে, ভেতরে সবাই যেন আলাদা দ্বীপ। এই নীরব দূরত্ব অনেক সময় চিৎকারের চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী হয়। শুরুটা হয়, “দেখি কে আগে কথা

বলে।” তারপর এক সপ্তাহ পর দুজনেরই মনে হয় এখন কথা শুরু করা অস্বস্তিকর। কেউ এগোয় না। মাস চলে যায়। এর মধ্যে নতুন নতুন ভুল বোঝাবুঝি জন্ম নেয়। তাই একটু সময় নেওয়া আর মানুষটাকে নীরবতায় শাস্তি দেওয়া এক জিনিস না।

আপনি যদি রাগের মাথায় কথা বন্ধ করে দিয়ে থাকেন, আবার শুরু করতে বড় কোনো speech দরকার নেই। “আম্মু, চা আছে?” দিয়েও শুরু হতে পারে। বাবাকে কোনো ছোট কাজ জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। হয়তো প্রথম কথোপকথনেই পুরোনো সমস্যা তুলবেন না। কয়েকদিন স্বাভাবিক যোগাযোগ ফিরিয়ে তারপর বলবেন, “সেদিনের ঘটনাটা নিয়ে এখনও আমার কষ্ট আছে। আমি চাই একদিন শান্তভাবে কথা বলতে।” অনেক সময় আমরা ভাবি সম্পর্ক ঠিক করতে হলে অন্যজন আগে এসে ক্ষমা চাইতে হবে। বাস্তবে সব মানুষ ক্ষমা চাইতে জানে না। কেউ ভেতরে অনুতপ্ত, কিন্তু মুখে বলতে পারে না। আপনি যদি নিজের দিক থেকে কথার দরজা খুলে দেন, তাতে অপর পক্ষের ভুল মাফ হয়ে গেল এমন না। শুধু দূরত্বটাকে আর বাড়তে দিলেন না।

মা বাবার জন্যও এখানে খুব জরুরি একটা কথা আছে। সন্তান রাগ করে নিজের ঘরে চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আরও দশটা কথা বলা সবসময় পরিস্থিতি ঠিক করে না। “বের হয়ে আয়, এখনও কথা শেষ হয়নি”, “এখনই উত্তর দে”, “আমার সামনে দরজা বন্ধ করার সাহস হয় কীভাবে”, এসব বলতে বলতে কখনো এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যেখানে দুপক্ষের কেউই নিজেকে সামলাতে পারে না। যদি নিরাপত্তার ঝুঁকি না থাকে, কিছু সময় দেওয়া অনেক সময় উপকারী। পরে গিয়ে বলা যায়, “মন শান্ত হলে এসো, কথা বলব।” সন্তানেরও জানা দরকার, এই বিরতিটা পালানোর সুযোগ না। শান্ত হওয়ার পরে আবার কথায় ফিরতে হবে। না হলে বিরতি ধীরে ধীরে এড়িয়ে যাওয়া হয়ে যায়।

কেউ যদি ইতিমধ্যে রাগ করে বের হয়ে গিয়ে থাকেন, সবচেয়ে বড় বাধা অনেক সময় ফিরে আসার লজ্জা। মনে হচ্ছে, “এখন গেলে কী বলব?” খুব জটিল কিছু বলতে হবে না। ফিরুন। নিরাপদে ফিরুন। তারপর বলুন, “আমি রাগের মাথায় চলে গিয়েছিলাম। আপনাদের চিন্তায় ফেলা ঠিক হয়নি। আমার কষ্টটা এখনও আছে, কিন্তু যেভাবে বের

হয়েছি সেটা ঠিক হয়নি।” আপনি নিজের আচরণের ভুল স্বীকার করলেন। এতে তাঁদের বলা সব কথা ঠিক হয়ে গেল না। পরে শান্ত সময়ে মূল সমস্যাটাও বলবেন। এই দুটি কথা আলাদা রাখতে পারা খুব দরকার। “আমি ভুল করেছি” বললে “তাই আপনারা ঠিক ছিলেন” হয়ে যায় না। আবার “আপনারা ভুল করেছেন” বললেও “তাই আমি যা করেছি সব ঠিক” হয়ে যায় না।

আর যদি সত্যিই এমন পরিস্থিতি হয় যেখানে বাসায় থাকা নিরাপদ নয়, মারধর, গুরুতর হুমকি, জোরপূর্বক আটকে রাখা বা বাস্তব ক্ষতির আশঙ্কা আছে, তখন বিষয়টা সাধারণ পারিবারিক রাগের মতো সামলানো যাবে না। নিরাপত্তাই আগে। নিরাপদ জায়গায় যাওয়া, বিশ্বস্ত মানুষকে জানানো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পেশাদার বা কর্তৃপক্ষের সাহায্য নেওয়া লাগতে পারে। মা বাবার হক অনেক বড়, কিন্তু কোনো মানুষকে বিপদের মধ্যে বসে থাকার শিক্ষা ইসলাম দেয় না। আবার একদিনের চিৎকার আর ধারাবাহিক গুরুতর নির্যাতনকে একই ভাষায় দেখাও ঠিক না। পরিস্থিতি যত গুরুতর, সাহায্য নেওয়ার ধরনও তত ভিন্ন হবে।

আমরা অনেক সময় একটা জিনিস ভুলে যাই। যে বাসাটা আজ আপনার কাছে অসহ্য লাগছে, সেই বাসার সঙ্গেও হয়তো আপনার জীবনের সবচেয়ে বেশি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। যে মায়ের ওপর আজ রাগ, তিনিই হয়তো জ্বরের রাতে আপনার পাশে বসে ছিলেন। যে বাবার কথায় আজ বুক ভেঙেছে, তিনিই হয়তো নিজের প্রয়োজন বাদ দিয়ে আপনার জন্য কিছু করেছেন। এই স্মৃতিগুলো তাঁদের বর্তমান ভুলকে মুছে দেয় না। কিন্তু বর্তমান ভুলটাও অতীতের সব ভালোবাসাকে মুহূর্তে মুছে দিতে পারে না। সম্পর্কের সত্য অনেক সময় একসঙ্গে দুইটা জিনিস ধরে রাখে। “আমি খুব কষ্ট পেয়েছি” সত্য। “আমি এখনও এই মানুষগুলোকে ভালোবাসি” এটাও সত্য হতে পারে।

তাই পরেরবার রাগে দরজার হাতলে হাত চলে গেলে নিজেকে কয়েক মিনিট সময় দিন। বের হতেই হলে জানিয়ে বের হন। নিরাপদ কোথাও যান। নিজের মাথা ঠান্ডা করুন। কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য হারিয়ে যাবেন না। আর ফিরে আসতে মন চাইলে অহংকারকে বলবেন না, “এখন আর যাওয়া যাবে না।” কখনো ঘরে ফিরে আসাটাই ঝগড়ার সবচেয়ে পরিণত উত্তর।

কারণ কিছু মুহূর্তে আমাদের আসলে বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। আমরা শুধু চাই, এই বাড়ির মানুষগুলো একবার বুঝুক আমরা কতটা কষ্ট পেয়েছি। কষ্টটা বলুন। সময় নিয়ে বলুন। প্রয়োজন হলে দূরত্ব নিন। কিন্তু কয়েক মিনিটের রাগকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে দেবেন না, যার কষ্ট বহন করতে হয় অনেক বছর।

অধ্যায় ০৭

ঘরের কষ্ট থেকে যখন নেশার দিকে পালাতে ইচ্ছে করে

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

পড়ার আগে জরুরি নোট

স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সম্পাদকীয় নোট: আসক্তি চিকিৎসাযোগ্য। পুনরায় ব্যবহার শুরু হলে সহায়তা ও চিকিৎসা নতুন করে মূল্যায়নের প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষ করে অ্যালকোহলে শারীরিক নির্ভরতা থাকলে হঠাৎ বন্ধ করা বিপজ্জনক হতে পারে; নিরাপদভাবে বন্ধ করার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এই নোট SAMHSA, NIAAA ও NHS-এর নির্দেশনার সারাংশ, ব্যক্তিগত চিকিৎসা নির্দেশ নয়।

নিরাপত্তা নির্দেশনা: অ্যালকোহলে শারীরিক নির্ভরতা থাকলে হঠাৎ বন্ধ করা বিপজ্জনক হতে পারে। ছাড়ার সময় গুরুতর বিভ্রান্তি, হ্যালুসিনেশন বা খিঁচুনি হলে জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন। নিরাপদভাবে বন্ধ করার পরিকল্পনা চিকিৎসকের সঙ্গে করুন। পরিবারের উৎসাহ চিকিৎসার বিকল্প নয়।

NHS: Alcohol-use disorder

প্রথমবার হয়তো সে নেশা করার জন্য নেশা করেনি। সেদিন বাসায় খুব ঝগড়া হয়েছিল। বাবা এমন কিছু বলেছেন যা মাথা থেকে নামছিল না। মা হয়তো পাশে দাঁড়ানোর বদলে আরও কিছু কথা শুনিয়েছেন। রাতে বন্ধুদের সঙ্গে বের হলো। একজন বলল, “এত চিন্তা করিস কেন? এটা নে, মাথা ঠান্ডা হয়ে যাবে।” সে জানত কাজটা ঠিক না। আগে অন্য কাউকে করতে দেখলে হয়তো নিজেই খারাপ ভাবত। কিন্তু সেদিন তার ভেতরে ভালো মন্দ বোঝার চেয়ে একটু সময়ের জন্য সবকিছু ভুলে থাকার ইচ্ছাটাই বড় ছিল। মনে হয়েছিল, “কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও যদি মাথাটা বন্ধ থাকে!” প্রথম দিন হয়তো তেমন কিছু হলো না। দ্বিতীয়বার নিজে থেকে খুঁজল না। কিন্তু আবার বাসায় ঝামেলা

হলো, আবার খুব একা লাগল, আবার সেই মানুষগুলোর কাছে গেল। ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক তৈরি হলো। ঘরে কষ্ট হলে বাইরে যেতে ইচ্ছে করে, বাইরে গেলে ওই জিনিসটার কথা মনে পড়ে। একসময় যে কাজটা ছিল কষ্ট থেকে কয়েক ঘণ্টার পালানোর পথ, সেটাই নতুন একটা কষ্ট হয়ে জীবনের মধ্যে বসে গেল।

এই জায়গায় আমরা খুব দ্রুত একটা কথা বলে ফেলি, “নষ্ট হয়ে গেছে।” পরিবারের কেউ জানতে পারলে, “তোর লজ্জা করে না?” “তোকে এই শিক্ষা দিয়েছি?” “তুই আমাদের মুখ দেখাস না।” ইসলামের দিক থেকে নেশাজাতীয় বস্তু সম্পর্কে কোনো অস্পষ্টতা নেই। আল্লাহ মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে থাকতে বলেছেন এবং বলেছেন এগুলো মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে দূরে সরায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নেশাসৃষ্টিকারী বস্তু হারাম। সূরা আল মায়িদা, ৫:৯০ থেকে ৯১; সহিহ মুসলিম, ২০০৩। কিন্তু কাউকে হারাম থেকে ফেরানোর জন্য শুধু “তুই খারাপ” বললেই সে ফিরে আসে না। বিশেষ করে যে মানুষটা ইতিমধ্যে আসক্তির মধ্যে ঢুকে গেছে, তার সমস্যাটা শুধু এতটুকু থাকে না যে সে জানে না কাজটা হারাম। অনেকেই খুব ভালো করেই জানে। সালাতের পরে কাঁদে, আল্লাহর কাছে বলে আর করবে না, রাতে আবার করে ফেলে। সকালে নিজের ওপর ঘৃণা হয়। কয়েকদিন বন্ধ রাখে, আবার কোনো ঝগড়া, একাকীত্ব, পুরোনো বন্ধু বা তীব্র টানের মুহূর্তে ফিরে যায়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে substance use disorder কে চিকিৎসাযোগ্য একটি স্বাস্থ্যসমস্যা হিসেবে দেখা হয় এবং relapse হওয়া মানেই মানুষটি আর সুস্থ হতে পারবে না বা চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছে এমন নয়। তাই গুনাহকে গুনাহ বলব, কিন্তু মানুষটাকে এমন একটা পরিচয় দিয়ে শেষ করে দেব না যেন তার ফেরার আর কোনো রাস্তা নেই।

অনেক তরুণের নেশার পেছনে পরিবারের সমস্যা থাকে না, এটাও সত্য। কৌতূহল, বন্ধুবান্ধব, আনন্দ, পরিবেশ, সহজলভ্যতা, নানা কারণ থাকতে পারে। আবার কারও ক্ষেত্রে ঘরের কষ্ট সত্যিই বড় ভূমিকা রাখে। সারাদিন বাইরে স্বাভাবিক থাকা ছেলেটা রাতে বাসায় ফিরতে ভয় পায়, কারণ জানে ফিরলেই জিজ্ঞাসাবাদ, তুলনা, অপমান বা

ঝগড়া অপেক্ষা করছে। মেয়েটা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকে, কারণ পরিবারের কাউকে নিজের কথা বলতে পারে না। কারও মনে হয় তার ব্যর্থতা নিয়ে বাসায় শুধু বিচার হয়, কেউ একবারও জিজ্ঞেস করে না, “তোর আসলে কী হয়েছে?” তখন যদি ভুল কোনো বন্ধু এসে এমন একটা জায়গা দেয় যেখানে কেউ বিচার করছে না, শুধু বলছে “চল, সব ভুলে থাক”, দুর্বল মুহূর্তে সেই জায়গাটা খুব আকর্ষণীয় লাগতে পারে। সমস্যা হলো, যে জিনিসটার কাছে আপনি শান্তি ধার নিতে গিয়েছিলেন, একটা সময় সে আপনার জীবন থেকেই দাম তুলতে শুরু করে। পড়াশোনায় প্রভাব পড়ে, টাকা লাগে, মিথ্যা বলতে হয়, মানুষের কাছ থেকে লুকাতে হয়, সালাত নষ্ট হয়, পুরোনো ভালো বন্ধুদের এড়িয়ে চলেন, নতুন এমন কিছু মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় যাদের সঙ্গে আপনার বন্ধনটাই দাঁড়িয়ে আছে ওই অভ্যাসের ওপর। তখন ঘরের কষ্ট আগের জায়গাতেই থাকে, তার সঙ্গে নতুন দশটা কষ্ট যোগ হয়।

এখানে একজন আসক্ত তরুণের ভেতরের লজ্জাটাও বুঝতে হবে। বাইরে থেকে মানুষ ভাবে সে কিছুই পরোয়া করে না। অথচ অনেক সময় সে নিজেই নিজের জীবন দেখে ভয় পায়। রাতে সিদ্ধান্ত নেয়, “কাল থেকে শেষ।” সকালে কিছুক্ষণ ভালো থাকে। দুপুরের দিকে মাথায় টান শুরু হয়। ফোন থেকে নম্বর delete করে, পরে আবার অন্য কারও কাছ থেকে নেয়। বাসায় টাকা চাইতে লজ্জা লাগে, মিথ্যা বলে। তারপর মিথ্যা বলার জন্য আবার নিজের ওপর ঘৃণা হয়। কেউ যখন বলে, “তুই তো নেশাখোর”, সে হয়তো রাগ দেখায়, কিন্তু শব্দটা ভেতরে গিয়ে বসে যায়। ধীরে ধীরে তার মনে হতে শুরু করে, “আমি আর ভালো মানুষ না। আমার দ্বারা আর হবে না।” এই জায়গাটা খুব বিপজ্জনক, কারণ মানুষ যখন মনে করে সে আর ফিরতেই পারবে না, তখন ফিরে আসার চেষ্টাটাও দুর্বল হয়ে যায়। নেশা নিয়ে stigma ও অপমান মানুষকে সাহায্য চাইতে বাধা দিতে পারে, এ কারণেই চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোও মানুষকে অপমানসূচক পরিচয়ে না ডেকে সমস্যাটাকে চিকিৎসাযোগ্য অবস্থা হিসেবে দেখার ওপর গুরুত্ব দেয়। একজন মুসলিম হিসেবে আমরা আরও একটা কথা জানি। আল্লাহর

কাছে গুনাহ বড় হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর রহমতের দরজা তার চেয়েও বড়। তাই কাউকে তার গুনাহের পরিচয় দিয়ে এমনভাবে চেপে দেওয়া যাবে না যে সে ভাবতে শুরু করে আল্লাহও তাকে আর চান না।

যদি আপনি নিজেই এই অবস্থার মধ্যে থাকেন, একটা কথা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝুন। “আমি চাইলে যখন খুশি ছেড়ে দেব” কথাটা বারবার বলে সময় নষ্ট করবেন না। যদি বহুবার ছাড়ার চেষ্টা করে ফিরে গিয়ে থাকেন, যদি নেশাটা আপনার পড়াশোনা, কাজ, টাকা, সম্পর্ক, ইবাদত বা স্বাভাবিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে, তাহলে একা একা নিজের ইচ্ছাশক্তির পরীক্ষা দেওয়াকে সাহস ভাববেন না। একজন বিশ্বস্ত মানুষকে বলুন। পরিবারের সবাইকে বলতে না পারলে এমন একজনকে বলুন যিনি আতঙ্কিত হয়ে আপনাকে অপমান করবেন না, আবার বিষয়টাকেও হালকা করবেন না। চিকিৎসক, addiction service, counsellor বা উপযুক্ত পেশাদার সহায়তা নিন। কোন পদার্থ ব্যবহার করছেন, কতদিন ধরে করছেন এবং কতটা ব্যবহার করছেন তার ওপর নির্ভর করে বন্ধ করার নিরাপদ পদ্ধতিও ভিন্ন হতে পারে। কিছু substance হঠাৎ বন্ধ করলে withdrawal গুরুতর হতে পারে, তাই “আজ থেকে সব শেষ” বলে চিকিৎসা পরামর্শ ছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে প্রয়োজনীয় medical support নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। Substance use disorder এর জন্য কার্যকর চিকিৎসা ও recovery support আছে, এবং সাহায্য নেওয়া দুর্বলতার স্বীকারোক্তি নয়।

শুধু নেশাটা সরালেই অনেকের সমস্যা শেষ হয় না। কারণ প্রশ্ন থেকে যায়, নেশাটা যে জায়গাটা পূরণ করছিল সেখানে এখন কী থাকবে? বাসায় ঝগড়া হলে আপনি কোথায় যাবেন? রাতে খুব একা লাগলে কাকে ফোন করবেন? যে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলেই পুরোনো অভ্যাস ফিরে আসে, তাদের জায়গায় কারা আসবে? দিনের কোন সময়টায় আপনার টান সবচেয়ে বেশি হয়? হাতে টাকা থাকলে কি সমস্যা বাড়ে? নির্দিষ্ট কোনো রাস্তা, জায়গা, মানুষ বা পরিস্থিতি কি আপনাকে আগের দিকে ফিরিয়ে নেয়? এগুলো নিজের কাছে লুকিয়ে রেখে recovery কঠিন হয়। জীবনটাকে এমনভাবে সাজাতে হয় যাতে পুরোনো অভ্যাসের পথগুলো একটু একটু করে বন্ধ হয় এবং নতুন পথ তৈরি

হয়। কোনো বন্ধুকে block করতে হতে পারে, কিছু জায়গায় যাওয়া বন্ধ করতে হতে পারে, নিজের টাকা কিছুদিন বিশ্বস্ত কারও সাহায্যে manage করতে হতে পারে, একা থাকার সময় কমাতে হতে পারে, সালাতের পর সরাসরি পুরোনো আড্ডায় ফিরে না গিয়ে অন্য routine বানাতে হতে পারে। কখনো কাউন্সেলিংয়ে গিয়ে সেই পুরোনো রাগ, অপমান বা একাকীত্বের কথাও খুলতে হবে যেটা এতদিন নেশা দিয়ে চেপে রেখেছিলেন। কারণ কষ্টটা ভেতরে একইভাবে রেখে শুধু তার ওপরের ওষুধটা কেড়ে নিলে মানুষ আবার অন্য কোনো পালানোর রাস্তা খুঁজতে পারে।

পরিবার যখন জানতে পারে, তাদের জন্যও সময়টা সহজ না। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় ভয়, রাগ, লজ্জা সব একসঙ্গে আসে। “মানুষ জানলে কী হবে?” “আমাদের ঘরে এটা কীভাবে হলো?” “কার সঙ্গে মিশে এসব শিখেছ?” প্রশ্নগুলো স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু প্রথম মুহূর্তেই যদি পুরো আলোচনা পরিবারের সম্মান নিয়ে চলে যায়, তাহলে যে মানুষটার সাহায্য দরকার সে আরও ভেতরে ঢুকে যায়। প্রথমে জানতে হবে সে কতটা নিরাপদ, কী ব্যবহার করছে, নিয়মিত কি না, চিকিৎসা দরকার কি না, ঋণ বা অন্য কোনো ঝুঁকিতে পড়েছে কি না। তারপর পরিবারের সীমা অবশ্যই থাকবে। নেশার জন্য টাকা দেওয়া যাবে না, মিথ্যা ঢেকে দেওয়া যাবে না, ঘরের অন্যদের ক্ষতির মধ্যে রাখা যাবে না। ভালোবাসা মানে সব আচরণের ফল থেকে কাউকে বারবার বাঁচিয়ে দেওয়া নয়। আবার কঠোরতা মানে তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলা, “মরলে মর”, এটাও নয়। একজন মানুষকে একই সঙ্গে বলা সম্ভব, “এই কাজ আমরা মেনে নেব না” এবং “তোমাকে এখান থেকে বের হতে আমরা সাহায্য করব।” এই দুই বাক্য একসঙ্গে থাকা দরকার।

আর যদি আপনি সেই ছেলে বা মেয়েটা হন, যে ইতিমধ্যে অনেক দূর চলে গেছে বলে মনে করছেন, আল্লাহর দিকে ফিরতে লজ্জা পাবেন না। “আমি কতবার তওবা করেছি, আবার করেছি, এবার আল্লাহ আমাকে কেন ক্ষমা করবেন?” এই চিন্তা আপনাকে তওবা থেকে দূরে সরানোর আরেকটা ফাঁদ হতে পারে। তওবা মানে শুধু রাতে কাঁদা নয়। সত্যিকারের ফেরার মধ্যে কাজও আছে। নেশার জিনিস সরানো, যাদের সঙ্গে থাকলে

ফিরে যান তাদের থেকে দূরে যাওয়া, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নেওয়া, ঋণ বা মিথ্যার ক্ষতি যতটা সম্ভব ঠিক করা, সালাত আবার ধরে রাখা, পড়ে গেলে আবার ওঠা। একদিন খুব ভালো গেল, পরের দিন আবার ভুল হলো, তখন "সব শেষ" বলে পুরো মাসটা নষ্ট করবেন না। চিকিৎসাবিজ্ঞানে recovery এর পথে relapse ঘটতে পারে এবং তখন treatment plan নতুনভাবে সাজানোর প্রয়োজন হতে পারে। ইসলামও আপনাকে গুনাহের পর আল্লাহ থেকে পালাতে শেখায় না। গুনাহ হয়েছে বলেই তো তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

একটা সময় হয়তো আপনি বুঝবেন, আপনি আসলে নেশাটাকে ভালোবাসতেন না। আপনি ভালোবাসতেন কয়েক ঘণ্টার সেই অনুভূতিটাকে, যখন মাথার ভেতরের শব্দগুলো একটু কমে যেত। আপনি চাইতেন বাবার কথাটা মনে না থাকুক। মায়ের সঙ্গে ঝগড়াটা ভুলে থাকতে। নিজের ব্যর্থতা নিয়ে ভাবতে না। একাকীত্বটা একটু কম লাগতে। কিন্তু যে শান্তি সকালে উঠে আরও বেশি ভয়, অপরাধবোধ আর অসহায়ত্ব নিয়ে আসে, সেটা শান্তি না। সেটা শুধু কষ্টটাকে কয়েক ঘণ্টা পরে ঠেলে দেওয়া।

আর মা বাবার জন্যও হয়তো সবচেয়ে কঠিন উপলব্ধি এটা যে সন্তান নেশায় গেছে মানেই সব দোষ পরিবারের না, কিন্তু পরিবারের পরিবেশের কোনো অংশ যদি তার কষ্ট বাড়িয়ে দিয়ে থাকে, সেটা দেখার সাহসও দরকার। শুধু বন্ধুকে দোষ দিয়ে, ফোন কেড়ে নিয়ে, মারধর করে, ঘরে আটকে রেখে যদি মূল সমস্যাটা একই থাকে, তাহলে অনেক সময় মানুষ শুধু আরও ভালোভাবে লুকাতে শেখে। একদিন শান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করুন, "তুই যখন এগুলো শুরু করেছিলি, তখন তোর জীবনে কী চলছিল?" উত্তরটা শুনতে কষ্ট হতে পারে। হয়তো সে এমন কিছু বলবে যার সঙ্গে আপনি একমত নন। তবু পুরোটা শুনুন। শোনা মানে তার নেশার দায় নিজের ওপর নেওয়া নয়। শোনা মানে মানুষটাকে বুঝে তাকে ফেরানোর দরজাটা খুঁজে দেখা।

ঘরের কষ্ট থেকে যে মানুষটা ভুল দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তার জন্য ঘরে ফেরার দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ করে দেবেন না। আর আপনি যদি সেই মানুষ হন, নিজেকেও শেষ ঘোষণা করবেন না। হয়তো অনেক কিছু নষ্ট হয়েছে। টাকা, সময়, সম্পর্ক, বিশ্বাস, ইবাদত। কিন্তু “অনেক নষ্ট হয়েছে” আর “সব শেষ হয়ে গেছে” এক কথা নয়।

নেশা আপনার একটা ভয়ংকর ভুল হতে পারে। আসক্তি আপনার জীবনের কঠিন একটা অধ্যায় হতে পারে। কিন্তু এটাকে আপনার পুরো পরিচয় হতে দেবেন না। আপনি এখনও ফিরতে পারেন। সাহায্য নিতে পারেন। আবার শুরু করতে পারেন।

অধ্যায় ০৮

যখন মনে হয়, “আর বাঁচতে চাই না”

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

পড়ার আগে জরুরি নোট

নিরাপত্তা আগে: নিজের ক্ষতি করার তাৎক্ষণিক আশঙ্কা থাকলে একা থাকবেন না। বিশ্বস্ত কাউকে সঙ্গে নিন এবং স্থানীয় জরুরি সেবা বা নিকটবর্তী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে সহায়তা নিন। সাহায্যকারী ব্যক্তি বিচার না করে শুনবেন, বিপজ্জনক উপকরণে প্রবেশ কমাতে সাহায্য করবেন এবং পেশাদার সহায়তার সঙ্গে যুক্ত করবেন। এটি NIMH-এর নির্দেশনার ভিত্তিতে যোগ করা সম্পাদকীয় নোট।

সহায়তাকারীর পাঁচটি কাজ: সরাসরি জিজ্ঞেস করুন আত্মহত্যার চিন্তা হচ্ছে কি না; বিচার না করে শুনুন; বিপজ্জনক উপকরণে প্রবেশ কমাতে সহায়তা করুন; বিশ্বস্ত ব্যক্তি ও পেশাদার সহায়তার সঙ্গে যুক্ত করুন; সংকটের পরও নিয়মিত খোঁজ নিন। সরাসরি প্রশ্ন করা আত্মহত্যার চিন্তা বাড়ায়, এমন প্রমাণ নেই। তাৎক্ষণিক ঝুঁকিতে একা ছেড়ে দেবেন না এবং স্থানীয় জরুরি সেবার সাহায্য নিন।

NIMH: পাঁচটি সহায়তার পদক্ষেপ

এই অধ্যায়ের ধর্মীয় আশ্বাস মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বন্ধ করা বা সাহায্য নিতে দেরি করার নির্দেশ নয়। তীব্র মনখারাপ, অনাগ্রহ বা আত্মহানির চিন্তাকে কেবল চরিত্রের দুর্বলতা ধরে নেওয়া যাবে না।

NIMH: Depression

রাত অনেক হয়েছে। বাসার সবাই হয়তো ঘুমিয়ে গেছে, কিন্তু আপনার ঘুম আসছে না। সন্ধ্যায় আবার ঝগড়া হয়েছে। বাবা এমন কিছু বলেছেন যা বারবার মনে পড়ছে। মা হয়তো বলেছেন, “তোমাকে নিয়ে আমরা আর পারি না।” কয়েক মাস ধরে পড়াশোনা বা কাজও ঠিক যাচ্ছে না। যাকে নিজের মানুষ মনে করেছিলেন, তার সঙ্গেও সম্পর্ক খারাপ। নিজের ভবিষ্যৎ কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পারছেন না। ফোনটা হাতে নিয়ে চুপচাপ

পড়ে আছেন। কাউকে message লিখতে গিয়েও মুছে দিলেন। কারণ মনে হচ্ছে, “বলেই বা কী হবে? কেউ তো বুঝবে না।” তারপর হঠাৎ মাথায় একটা চিন্তা আসে, “আমি যদি না থাকি, তাহলে হয়তো সব ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে।” চিন্তাটা আসার পর নিজেই ভয় পেয়ে যান। একটু পর আবার মনে হয়, “আসলে আমাকে দিয়ে আর হবে না। সবাই আমার জন্য কষ্ট পায়। আমি না থাকলেই হয়তো ভালো।” বাইরে থেকে কেউ দেখলে হয়তো বুঝবেই না এই মানুষটার মাথার ভেতরে তখন কত বড় একটা যুদ্ধ চলছে।

এই জায়গায় আমি প্রথমেই একটা ভুল ধারণা ভাঙতে চাই। কারও মনে আত্মহত্যার চিন্তা এসেছে শুনে সঙ্গে সঙ্গে “তোমার ঈমান দুর্বল”, “এসব নাটক করো না”, “আল্লাহকে ভয় করলেই এসব চিন্তা আসত না” বলা খুব ক্ষতিকর হতে পারে। আত্মহত্যা ইসলামে নিষিদ্ধ, এতে কোনো দ্বিধা নেই। আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।” সূরা আন নিসা, ৪:২৯। কিন্তু আত্মহত্যার চিন্তা মাথায় আসা আর আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করা একই বিষয় নয়। তীব্র হতাশা, অসহনীয় মানসিক কষ্ট, একাকীত্ব, সম্পর্কের ভাঙন, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, অপমান, আর্থিক সমস্যা, মানসিক অসুস্থতা বা নেশাজনিত সমস্যা মানুষের আত্মহত্যার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, অনেক আত্মহত্যা এমন সংকটের সময় ঘটে যখন মানুষের কাছে পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার পথ আর দেখা যায় না। তাই এই অবস্থায় থাকা মানুষকে আগে শুনতে হবে। তার ঈমানের বিচার বসানোর আগে তাকে নিরাপদ রাখতে হবে।

অনেক সময় যে মানুষটা বলে, “আমি মরে যেতে চাই”, সে আসলে মৃত্যুকে ভালোবেসে কথাটা বলছে না। সে যে জীবনটা এখন কাটাচ্ছে, সেই অসহনীয় কষ্টটা আর বহন করতে পারছে না। তার মনে হয় সব রাস্তা বন্ধ। বাবা তাকে বুঝবেন না, মা তার পাশে দাঁড়াবেন না, পড়াশোনা শেষ হবে না, চাকরি হবে না, মানুষ তাকে সম্মান করবে না, নিজের ভুলগুলো কখনো ঠিক হবে না। একটা সমস্যা তখন আর একটা সমস্যা থাকে না। মাথার ভেতরে সবকিছু একসঙ্গে জড়িয়ে যায়। “আজকে আমার

বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে” থেকে চিন্তা চলে যায় “আমার পরিবার আমাকে চায় না”, তারপর “আমার জীবনে কেউ নেই”, তারপর “আমার ভবিষ্যৎও নেই।” এই অবস্থাকে বাইরে থেকে বসে খুব সহজে বলা যায়, “এত ছোট ব্যাপারে কেউ এসব ভাবে?” কিন্তু যার মাথার ভেতরে চিন্তাগুলো চলছে, তার কাছে তখন ব্যাপারটা ছোট থাকে না। NIMH আত্মহত্যার গুরুত্বপূর্ণ warning sign হিসেবে hopeless বা trapped অনুভব করা, বেঁচে থাকার কোনো কারণ নেই মনে হওয়া, অসহনীয় মানসিক কষ্ট, নিজেকে অন্যের বোঝা মনে করা এবং পরিবার বা বন্ধুদের থেকে দূরে সরে যাওয়ার মতো পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে।

এই অবস্থায় যদি আপনি নিজেই থাকেন, তাহলে একটা কাজ করবেন না। একা একা নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বসবেন না। আপনার মন হয়তো বলবে, “কাউকে বললে সবাই আমাকে পাগল ভাববে”, “মা জানলে আরও বকবে”, “বন্ধুকে বললে আমাকে দুর্বল ভাববে।” তবু একজন মানুষকে বলুন। খুব সুন্দর করে বলতে হবে না। “আমার মনে হচ্ছে আমি আর পারছি না”, “আমার নিজের ক্ষতি করার চিন্তা আসছে”, “আজ আমাকে একা রেখো না”, এতটুকুই যথেষ্ট। আর যদি আপনার মনে নিজের ক্ষতি করার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা চলে আসে, সেটা করার সুযোগ বা উপায় আপনার কাছে থাকে, অথবা মনে হয় আপনি নিজেকে সামলাতে পারবেন না, তখন এটাকে সাধারণ মন খারাপ হিসেবে নেবেন না। একা থাকবেন না। কাছের বিশ্বস্ত কাউকে সঙ্গে নিন এবং দ্রুত জরুরি চিকিৎসা বা মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা নিন। এই অবস্থায় গোপন রাখা নিরাপদ নয়। NIMH স্পষ্টভাবে পরামর্শ দেয়, কেউ আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে বললে তাকে একা না রাখতে, বিষয়টি গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি না দিতে এবং নিরাপদ সহায়তার সঙ্গে যুক্ত করতে।

আর আপনি যদি এমন কারও বন্ধু, ভাইবোন বা মা বাবা হন এবং সে বলে, “আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে”, কখনো হেসে উড়িয়ে দেবেন না। “ও attention চাইছে” ভেবে বসবেন না। আত্মহত্যা নিয়ে কথা বলা তীব্র কষ্টের সংকেত হতে পারে এবং তা গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া দরকার। সরাসরি জিজ্ঞেস করতে ভয় পাবেন না, “তোমার কি নিজের

জীবন শেষ করার চিন্তা আসছে?” অনেকেই ভয় পান এমন প্রশ্ন করলে নাকি মাথায় নতুন ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। গবেষণাভিত্তিক নির্দেশনায় NIMH বলছে, সরাসরি আত্মহত্যার চিন্তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা সেই চিন্তা বাড়ায় না, বরং মানুষটার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথোপকথন শুরু করতে সাহায্য করতে পারে। তারপর তাকে বক্তৃতা না দিয়ে শুনুন। “তুই এসব কীভাবে ভাবলি?” বলে ধমকানোর বদলে বলুন, “আমি শুনছি। কী হয়েছে বল।” সে যা বলছে তার সব ব্যাখ্যার সঙ্গে আপনাকে একমত হতে হবে না। কিন্তু সে যেন অন্তত বুঝতে পারে, এই মুহূর্তে তার জীবন আপনার কাছে তার পরীক্ষার result, তার আচরণ বা পরিবারের সম্মানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ করে মা বাবার জন্য এই জায়গাটা খুব কঠিন হতে পারে। সন্তান যদি বলে, “তোমাদের জন্যই আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে”, কথাটা শুনে প্রথমেই নিজের পক্ষ নেওয়ার ইচ্ছা হবে। “আমরা তোর জন্য এত কিছু করলাম, এখন আমাদের দোষ?” এটা খুব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজের বিচার পরে রাখুন। হতে পারে সন্তানের কথা পুরোপুরি ন্যায্য নয়, হতে পারে সে রাগের মধ্যে অনেক কিছু একসঙ্গে বলছে, হতে পারে আপনার সত্যিই কিছু ভুলও আছে। কোনটা কতটুকু সত্য সেটা পরে দেখা যাবে। প্রথমে জানতে হবে সে নিরাপদ কি না। সে কি শুধু অসহায় লাগার কথা বলছে, নাকি নিজের ক্ষতির পরিকল্পনাও করছে? সে কি একা থাকতে চাইছে? হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অন্যকে দিয়ে দিচ্ছে, বিদায়সূচক কথা বলছে, খুব hopeless কথা বলছে, নেশার পরিমাণ বেড়েছে বা আচরণ হঠাৎ অস্বাভাবিক বদলে গেছে কি না, এসব warning sign গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। এই অবস্থায় “মানুষ জানলে বদনাম হবে” ভেবে সাহায্য দেরি করা খুব বিপজ্জনক হতে পারে।

ইসলামের কথা এখানে কীভাবে বলব, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। ভয় দেখানোর জন্য শুধু শাস্তির কথা সামনে এনে এমন একজন মানুষকে আরও hopeless করে দেওয়া ঠিক পদ্ধতি না। আল্লাহ আত্মহত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, কারণ এই জীবন আমাদের নিজের বানানো সম্পদ নয়। জীবন আল্লাহর আমানত। কিন্তু যে আল্লাহ বলেছেন নিজের জীবন শেষ করো না, সেই আয়াতেই বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।”

আর যে মানুষটা নিজের গুনাহ, ব্যর্থতা বা ভাঙা জীবন দেখে ভাবছে আল্লাহর কাছেও তার আর ফেরার জায়গা নেই, তাকে আল্লাহ বলেন, “হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।” সূরা আয যুমার, ৩৯:৫৩। লক্ষ্য করুন, আল্লাহ এখানে নিখুঁত মানুষদের ডাকছেন না। যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে, তাদেরও বলছেন নিরাশ হয়ো না। অর্থাৎ আপনার জীবন এলোমেলো হয়ে গেছে, গুনাহ হয়েছে, মানুষ হতাশ হয়েছে, নিজের কাছেও নিজেকে অসহ্য লাগছে, তবু আল্লাহর দিকে ফেরার দরজা বন্ধ হয়নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্টের কারণে মৃত্যু কামনা না করতে বলেছেন। আর যদি কারও কষ্ট এত বেড়ে যায় যে এই চিন্তা সামলানো কঠিন হয়, তিনি একটি দু‘আ শিখিয়েছেন, “হে আল্লাহ, যতদিন জীবন আমার জন্য কল্যাণকর, আমাকে জীবিত রাখুন; আর যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর, তখন আমাকে মৃত্যু দিন।” সহিহ বুখারি, ৫৬৭১। এই দু‘আর মধ্যে একটা গভীর শিক্ষা আছে। মানুষ তখন বলছে না, “আমি জানি আমার জন্য মৃত্যু ভালো।” সে নিজের বিচারটা আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছে। কারণ তীব্র কষ্টের সময়ে আমরা ভবিষ্যৎ দেখতে পাই না। আজ যেটাকে জীবনের শেষ মনে হচ্ছে, ছয় মাস পর সেই জায়গা থেকে জীবন সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে পারে। যে সম্পর্কটাকে মনে হয়েছিল কোনোদিন ঠিক হবে না, সেটা বদলাতে পারে। যে পরীক্ষা বা চাকরির ব্যর্থতাকে মনে হয়েছিল সব শেষ, তার পরেও অন্য পথ আসতে পারে। মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা হতে পারে। পরিবার বদলাতে পারে। মানুষ নতুন সাহায্য পেতে পারে। আজ আপনি ভবিষ্যতের কোনোটা দেখছেন না বলে ভবিষ্যৎ নেই, এমন নয়।

এখানে “আল্লাহ কারও ওপর তার সামর্থ্যের বাইরে বোঝা দেন না” আয়াতটাও আমরা অনেক সময় এমনভাবে বলি যেন কষ্টে থাকা মানুষকে বলা হচ্ছে, “দেখো, তুমি অবশ্যই একা সামলাতে পারবে।” আয়াতটি হলো সূরা আল বাকারাহ, ২:২৮৬, যেখানে আল্লাহ বলেন তিনি কোনো প্রাণকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সাহায্য চাইতে হবে না, ডাক্তার লাগবে না, কাউন্সেলর দরকার নেই, পরিবারের কাছে যেতে হবে না। আল্লাহ মানুষের জন্য মানুষকেও মাধ্যম করেন। ক্ষুধা লাগলে

আমরা খাবার খাই, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করি, বিপদে মানুষের সাহায্য নিই। মানসিক কষ্ট এত বেড়ে গেলে যে নিজের জীবনই নিরাপদ মনে হচ্ছে না, তখন সাহায্য নেওয়াও সেই সামর্থ্য ব্যবহারের অংশ। “আমি মুসলিম, তাই আমার therapist লাগবে কেন?” যেমন ভুল, তেমনি “আমি treatment নিচ্ছি, তাই দু‘আর দরকার নেই” ভাবাও অসম্পূর্ণ। সালাত, দু‘আ, কুরআন, মানুষের সঙ্গ, চিকিৎসা, counselling, নিরাপদ environment, এগুলো একে অপরের শত্রু না।

আর যদি আপনার মাথায় এমন চিন্তা আসে, নিজেকে একটা কথা মনে করিয়ে দিতে পারেন, এই মুহূর্তে আমার মনের কথা সবসময় ভবিষ্যতের সত্য না। মন বলছে, “কেউ আমাকে চায় না।” একটু থেমে দেখুন, সত্যিই কি পৃথিবীতে একজন মানুষও নেই যাকে এখন ফোন করা যায়? মন বলছে, “আমার দ্বারা আর কখনো কিছু হবে না।” আপনি কি সত্যিই আগামী দশ বছরের সব ঘটনা জানেন? মন বলছে, “আমার জন্য সবাই ভালো থাকবে যদি আমি না থাকি।” এই সিদ্ধান্তটা আপনি এখন এমন এক অবস্থায় নিচ্ছেন যখন নিজের মূল্যটাই অনুভব করতে পারছেন না। তাই সেই চিন্তার ওপর স্থায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন না। আজকের লক্ষ্য পুরো জীবন সমাধান করা না। আজকের লক্ষ্য হতে পারে শুধু আজ রাতটা নিরাপদ থাকা। কারও সঙ্গে থাকা। বিপজ্জনক জিনিস থেকে দূরে থাকা। প্রয়োজন হলে চিকিৎসা নেওয়া। ঘুমানো। পরদিন আবার সাহায্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। Crisis এর সময় safety plan এবং বিশ্বস্ত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

পরিবারের ঝগড়া যদি আপনার এই অবস্থার বড় কারণ হয়, তখনও একটা বিষয় মনে রাখুন। আপনাকে এখনই মা বাবাকে বুঝিয়ে জিততে হবে না। হয়তো কিছু সময়ের জন্য নিরাপদ আত্মীয়ের কাছে থাকা দরকার। হয়তো পরিবারের সঙ্গে counsellor বা দায়িত্বশীল তৃতীয় কাউকে নিয়ে বসা দরকার। হয়তো কিছুদিন কিছু sensitive বিষয়ে কথা কমাতে হবে। আপনার জীবন বাঁচিয়ে রাখতে যেটা প্রয়োজন, সেটাই আগে। পরে সম্পর্কের বিচার হবে। একইভাবে মা বাবারও মনে রাখা উচিত, সন্তান যখন জীবন নিয়ে hopeless অবস্থায় আছে তখন পুরোনো শাসনের একই পদ্ধতি আরও জোরে প্রয়োগ

করলে সবসময় কাজ করবে না। ফোন কেড়ে নেওয়া, দরজা বন্ধ করে রাখা, “আজ থেকে কোথাও যাবি না”, “মানুষকে বললে আমাদের সম্মান থাকবে না”, এসবের আগে পেশাদারভাবে ঝুঁকিটা বোঝা দরকার। নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু সেটা ভয় আর অপমানের পরিবেশ বানিয়ে নয়।

হয়তো আপনি এই লেখা পড়ছেন এবং আপনার মনে ইতিমধ্যে কয়েকবার এমন চিন্তা এসেছে। কাউকে এখনও বলেননি। বাইরে থেকে স্বাভাবিক থাকেন। পোস্ট দেন, কাজ করেন, মানুষের সঙ্গে হাসেন। রাতে শুধু খুব ক্লান্ত লাগে। তাহলে আজ অন্তত একজন মানুষকে বলুন। সব গল্প একবারে বলতে হবে না। শুধু বলুন, “কিছুদিন ধরে আমার মাথায় নিজের জীবন নিয়ে খারাপ চিন্তা আসছে। আমি একা এটা সামলাতে পারছি না।” এই একটি বাক্য হয়তো আপনার জীবনের সবচেয়ে কঠিন বাক্য হবে। কিন্তু এটিই সাহায্যের প্রথম দরজা হতে পারে।

আপনার এখন জীবনকে ভালো লাগতেই হবে, এমন না। আজ খুব আশাবাদী অনুভব করতেই হবে, এমনও না। শুধু আজ নিজের বিরুদ্ধে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার কষ্টকে গুরুত্ব দিন, কিন্তু কষ্টের কথাকেই শেষ সত্য বানাবেন না। সাহায্য নিন। কারও হাত ধরুন। আল্লাহর কাছে কাঁদুন। চিকিৎসার দরজায় যান। আবার সালাতে দাঁড়ান, যদিও মন বসে না। আর মনে রাখুন, যে মানুষটা আজ ভাবছে “আমার আর কোনো পথ নেই”, সে সব পথ দেখতে পাচ্ছে না বলেই পথ নেই, এটা প্রমাণ হয় না।

আপনি হয়তো এখন জীবন শেষ করতে চাইছেন না। আপনি হয়তো শুধু চান এই অসহনীয় কষ্টটা শেষ হোক। কষ্ট শেষ করার জন্য জীবন শেষ করতে হয় না। কষ্টের চিকিৎসা আছে, সাহায্য আছে, মানুষ আছে, আর আল্লাহর রহমতের দরজা এখনও খোলা আছে।

অধ্যায় ০৯

এত কিছুর পরেও সম্পর্কটা কি আবার সুন্দর করা সম্ভব?

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট

সম্পাদকীয় সূত্র নোট: কোমলতা কোনো বিষয়কে সুন্দর করে, তার অনুপস্থিতি তাকে অসুন্দর করে, এই বক্তব্য সহিহ মুসলিম ২৫৯৪a-তে আছে। ক্ষমা ও সম্পর্ক মেরামতের আলোচনা নিরাপত্তা বা প্রয়োজনীয় সীমা বাদ দেওয়ার নির্দেশ নয়।

একই বাসায় থাকেন, কিন্তু আগের মতো কথা হয় না। মা কিছু জিজ্ঞেস করলে প্রয়োজনের বেশি উত্তর দেন না। বাবার সঙ্গে একসঙ্গে বসা হয়, কিন্তু নিজের জীবনের কথা আর বলেন না। বাইরে থেকে দেখলে কোনো সমস্যা চোখে পড়বে না। ঈদে একসঙ্গে ছবি হয়, আত্মীয়দের সামনে স্বাভাবিক কথা হয়, অসুস্থ হলে খোঁজও নেন। কিন্তু আপনি জানেন, মাঝখানে কোথাও একটা দেয়াল উঠে গেছে। হয়তো কোনো একদিনের বড় ঝগড়া থেকে, হয়তো বছরের পর বছর ছোট ছোট কষ্ট জমে। এখন মনে হয়, “সম্পর্ক তো আছে, কিন্তু আগের মতো কিছু নেই।” আবার কখনো মনে হয়, “আমি চেষ্টা করেই বা কী লাভ? উনারা তো বদলাবেন না।” এই সিরিজের শেষ পর্বে তাই কোনো সুন্দর আবেগের গল্প দিয়ে বলব না যে একদিন সবাই বসে কাঁদল, ক্ষমা চাইল, তারপর সব ঠিক হয়ে গেল। বাস্তব পরিবারে অনেক সময় সম্পর্ক এভাবে ঠিক হয় না। কোনো কোনো বাবা কোনোদিন মুখে “আমার ভুল হয়েছে” বলেন না। কোনো মা নিজের কষ্টের ভাষার বাইরে সন্তানের কষ্ট বুঝতে অনেক সময় নেন। কোনো সন্তানও বহু বছরের ক্ষোভ একদিনে নামিয়ে রাখতে পারে না। তবু সম্পর্ক ভালো হওয়ার মানে

সবকিছু আগের মতো হওয়া না। কখনো ভালো হওয়ার শুরু হয় শুধু এতটুকু দিয়ে যে আগের মতো প্রতিদিন আঘাত লাগে না, কথা বলা আবার সম্ভব হয়, আর কেউ কাউকে শত্রু মনে করে না।

অনেকেই সম্পর্ক ঠিক করার আগে একটা শর্ত রেখে বসে থাকেন, “আগে উনি বুঝুক উনি কী করেছেন। আগে উনি sorry বলুক। তারপর আমি স্বাভাবিক হব।” এই চাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। যে কষ্ট পেয়েছে, তার মনে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রয়োজন থাকে। আপনি চান বাবা একবার বলুন, “হ্যাঁ, ওই সময় আমি তোকে খুব কঠিন কথা বলেছিলাম।” চান মা স্বীকার করুন, “তোকে অন্যদের সঙ্গে তুলনা করে আমি ভুল করেছি।” কিন্তু বাস্তবতার কষ্টকর দিক হলো, আপনি যাঁর কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি চাইছেন তিনি হয়তো নিজের আচরণকে এখনও ভুল মনে করেন না। অথবা বুঝলেও বলতে পারেন না। তাহলে কি আপনার জীবনও সেই একটি বাক্যের জন্য আটকে থাকবে? ক্ষমা করা, সম্পর্কের দরজা খোলা আর যা হয়েছে সেটাকে ঠিক বলে দেওয়া এক জিনিস নয়। আপনি বলতে পারেন, “আমি এখনও মনে করি ওই আচরণটা ভুল ছিল। আমার কষ্টও পুরোপুরি যায়নি। কিন্তু আমি চাই না এই ঘটনাটা আমাদের বাকি জীবন চালাক।” এই সিদ্ধান্ত অন্য মানুষটার ভুল মুছে দেয় না। বরং আপনার জীবনের নিয়ন্ত্রণটা ধীরে ধীরে সেই ঘটনার হাত থেকে ফিরিয়ে আনে।

সম্পর্ক মেরামত শুরু করার সবচেয়ে ভালো জায়গা অনেক সময় বড় discussion না, ছোট ছোট স্বাভাবিকতা। কিছু পরিবারে মাসের পর মাস কথা বন্ধ থাকার পর সন্তান হঠাৎ এক রাতে বসে পাঁচ বছরের সব অভিযোগ খুলে দেয়। এরপর আবার ঝগড়া। কারণ দুজনের কারও মনই এত বড় কথোপকথনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার চেয়ে কখনো প্রথম কাজ হলো আবার সালাম দেওয়া, একসঙ্গে চা খাওয়া, বাজার থেকে ফেরার পথে মায়ের প্রয়োজনের কিছু নিয়ে আসা, বাবাকে জিজ্ঞেস করা তাঁর ডাক্তার দেখানোর দিন কবে, কোনো পুরোনো বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চাওয়া। এগুলো অভিনয়

নয়। আপনি নিজের কষ্ট ভুলে যাননি। শুধু সম্পর্কের মধ্যে যে স্বাভাবিক যোগাযোগটুকু মরে গিয়েছিল সেটা আবার ফিরিয়ে আনছেন। অনেক সময় মানুষ গভীর কথা বলার নিরাপত্তা পায় এই ছোট ছোট স্বাভাবিকতার ভেতর দিয়েই।

তারপর কোনো শান্ত দিনে নির্দিষ্ট একটা বিষয় নিয়ে কথা বলা যায়। সব অভিযোগ একসঙ্গে না। “আমার শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত আপনারা যা যা করেছেন” এই তালিকা খুললে দুপক্ষই ক্লান্ত হয়ে যাবে। এমন একটা বিষয় বেছে নিন যেটা এখনও সম্পর্ককে প্রভাবিত করছে। বলতে পারেন, “আব্বু, একটা কথা অনেক দিন ধরে বলতে চাই। আমি ঝগড়া করতে চাই না। শুধু চাই আপনি জানুন, ওই সময় যখন আমাকে বারবার বলা হয়েছিল আমার দ্বারা কিছু হবে না, তখন আমি নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখন আমি চেষ্টা করছি সেটা থেকে বের হতে।” অথবা, “আম্মু, আমি জানি আপনি আমার ভালো চান। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তুলনা করলে আমি আপনার থেকে দূরে সরে যাই। আপনি যদি আমার ভুল সরাসরি বলেন, আমি সেটা বেশি ভালোভাবে নিতে পারি।” এখানে লক্ষ্য হবে অতীতের বিচার শেষ করা নয়, ভবিষ্যতে কী বদলালে সম্পর্কটা ভালো হবে সেটা বোঝানো।

আপনার নিজের কোনো ভুল থাকলে সেটাও আলাদা করে স্বীকার করুন। “আমি রাগ করে কয়েকদিন কথা বলিনি, সেটা ঠিক হয়নি।” “আমি সেদিন এমন একটা কথা বলেছিলাম যেটা বলা উচিত ছিল না।” “আমি আপনাদের কিছু না জানিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সেটা ভালোভাবে handle করিনি।” নিজের ভুলের পাশে সঙ্গে সঙ্গে “কিন্তু আপনি আগে…” বসাবেন না। আমরা অনেক সময় ক্ষমা চাইতেও এমনভাবে চাই যে আসলে ক্ষমা চাই না। বলি, “আমি চিৎকার করেছি ঠিক, কিন্তু আপনি আমাকে বাধ্য করেছেন।” এতে দায়িত্বটা আবার অন্যজনের ওপর চলে গেল। নিজের অংশটুকু নিজের নামে নিন। তারপর অন্যদিন তাঁর অংশ নিয়ে কথা বলুন। এতে আপনি ছোট হয়ে যান না। বরং সম্পর্কের ভেতরে এমন একটা ভাষা তৈরি হয় যেখানে ভুল স্বীকার করা পরাজয় মনে হয় না।

একই সঙ্গে একটা জিনিসও বুঝতে হবে, সম্পর্ক মেরামত শুধু সন্তানের দায়িত্ব না। মা বাবারও কাজ আছে। যদি সন্তান বহুদিনের কষ্ট নিয়ে এসে কথা বলে, তখন শুধু নিজের ত্যাগের হিসাব খুললে সে আবার বন্ধ হয়ে যাবে। “তোর জন্য কী করিনি?” হয়তো সত্যি, আপনি অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু মানুষ একসঙ্গে কৃতজ্ঞ এবং আহত দুটোই হতে পারে। সন্তান আপনার ত্যাগ অস্বীকার না করেও বলতে পারে আপনার কোনো একটা আচরণ তাকে কষ্ট দিয়েছে। ওই কথাটা শুনে যদি প্রথমবার আপনার মনে হয়, “আমি তো খারাপ উদ্দেশ্যে বলিনি”, তখনও একটু থামুন। উদ্দেশ্য ভালো ছিল কি না সেটা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কথাটা তার ওপর কী প্রভাব ফেলেছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। কখনো একটা সম্পর্ক বদলে যায় শুধু এই একটি বাক্যে, “আমি বুঝিনি তুই এতটা কষ্ট পেয়েছিলি।” সব ভুলের ব্যাখ্যা দরকার হয় না, কিছু ভুলের সামনে শুধু শোনা দরকার।

সম্পর্ক ঠিক করতে চাইলে দুপক্ষকেই একটা পুরোনো অভ্যাস ছাড়তে হবে, অতীতের সব ঘটনা বর্তমানের প্রতিটি ঝগড়ায় এনে রাখা। পাঁচ বছর আগে ছেলে একটা ভুল করেছে, আজ অন্য বিষয়ে কথা উঠলেও সেটা ফিরে আসে। মা একসময় কোনো অন্যায় করেছিলেন, এখন তিনি ভালো কিছু বললেও সন্তান মনে মনে বলে, “উনি এমনই।” মানুষ বদলানোর চেষ্টা করলে তার পুরোনো পরিচয়টা যদি আমরা প্রতিদিন তার সামনে রেখে দিই, তাহলে সে বদলানোর উৎসাহ হারায়। কোনো গুরুতর ক্ষতি ভুলে যেতে হবে এমন কথা নয়। কিন্তু প্রতিটি নতুন দিনকে পুরোনো মামলার আরেকটা hearing বানালে সম্পর্ক সামনে যাবে না। আপনি দেখুন, গত ছয় মাসে কী পরিবর্তন হয়েছে। বাবা কি আগের চেয়ে শুনছেন? মা কি তুলনা কমিয়েছেন? সন্তান কি গলার স্বর সামলাচ্ছে? ছোট পরিবর্তনকেও জায়গা দিন। সবকিছু perfect না হওয়া পর্যন্ত কোনো পরিবর্তনকেই মূল্য না দিলে মানুষ একসময় চেষ্টা বন্ধ করে দেয়।

অনেক দূরত্ব আসলে তৈরি হয় কারণ দুজন মানুষই একে অপরের ভেতরের ভয়টা জানে না। বাবা শুধু বলেন, “এই চাকরি ছাড়বি না।” সন্তান শুনে, “তুমি আমার ওপর বিশ্বাস করো না।” অথচ বাবার ভেতরে হয়তো ভয়, “আমি জীবনে বেকার থাকার কষ্ট দেখেছি, আমার ছেলেটা যেন সেটা না দেখে।” মা বলেন, “ওই পরিবারে বিয়ে করতে দেব না।”

মেয়ে শুনে, “আমার পছন্দের কোনো দাম নেই।” হয়তো মায়ের ভেতরে এমন কোনো ভয় আছে যেটা তিনি ঠিকভাবে বলতে পারছেন না। তাই কখনো শুধু নিজের কথা বলার বদলে জিজ্ঞেস করুন, “আপনি সবচেয়ে বেশি কী নিয়ে ভয় পাচ্ছেন?” উত্তরটা মন দিয়ে শুনুন। সব ভয় যৌক্তিক হবে না। কিন্তু ভয়টা জানতে পারলে মানুষটার আচরণ অন্তত একটু বোঝা যায়। একইভাবে মা বাবাও জিজ্ঞেস করতে পারেন, “তুই আসলে কী হারানোর ভয় পাচ্ছিস?” এই প্রশ্নগুলো অনেক ঝগড়ায় কেউ কখনো করে না।

আল্লাহ বলেন, “ভালো ও মন্দ সমান নয়। মন্দকে প্রতিহত করো যা উত্তম তা দিয়ে। তখন যার সঙ্গে তোমার শত্রুতা ছিল, সে যেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো হয়ে যেতে পারে।” সূরা ফুসসিলাত, ৪১:৩৪। এই আয়াত বিশেষভাবে মা বাবার সম্পর্ক নিয়ে নাযিল হয়নি, কিন্তু মানুষের আচরণ বদলে দেওয়ার একটা বড় নীতি শেখায়। খারাপের জবাবে সবসময় একই ধরনের খারাপ দিলে দূরত্ব বাড়ে। কখনো আপনি এমন একটা আচরণ বেছে নেন যা অপর পক্ষ আশা করেনি। বাবা রেগে কথা বলেছেন, আপনি পরে ওষুধটা এনে দিলেন। মায়ের সঙ্গে মন খারাপ, তবু তাঁর প্রয়োজনের কাজটা করে দিলেন। এর মানে আপনি তাঁর কথাটা মেনে নিয়েছেন না। বরং আপনি নিজের চরিত্রকে তাঁর রাগের হাতে দেননি। তবে এটাকে কোনো formula ভাববেন না যে আপনি তিনদিন ভালো ব্যবহার করলেই অন্য মানুষ বদলে যাবেন। মানুষ বদলাতে সময় লাগে, কেউ হয়তো খুব ধীরে বদলাবেন। ভালো কাজের মূল্য শুধু সামনের মানুষ বদলাল কি না দিয়ে মাপা যায় না।

এই সম্পর্কের মধ্যে দু‘আর জায়গাটাও গভীর। আমরা অনেক সময় মা বাবার জন্য দু‘আ করি তাঁদের অসুস্থতার সময়, কিন্তু সম্পর্কের জন্য খুব কম করি। আল্লাহর কাছে বলতে পারেন, “হে আল্লাহ, আমাদের কথা বলার ভাষা নরম করুন। আমাদের একজনের ভুল আরেকজনকে বুঝতে দিন। আমার ভেতরে যে অহংকার আছে তা কমিয়ে দিন। তাঁদের ভেতরে আমার জন্য যে ভয় আছে সেটাকে হিকমাহতে বদলে দিন।” আর নিজের কষ্টের কথাও আল্লাহকে বলতে পারেন। আল্লাহর কাছে মা বাবার বিরুদ্ধে মামলা করার

ভাষায় নয়, নিজের হৃদয় খুলে। “আমি তাঁদের ভালোবাসতে চাই, কিন্তু আমার ভেতরে অনেক ক্ষোভ। আমাকে সাহায্য করুন।” কখনো সম্পর্কের জন্য সবচেয়ে জরুরি পরিবর্তনটা অন্য মানুষে নয়, নিজের ভেতরে শুরু হয়।

তবে এই পুরো আলোচনার মধ্যে একটা সীমা স্পষ্ট থাকা দরকার। সম্পর্ক মেরামতের নামে কাউকে এমন পরিস্থিতিতে ফেরত পাঠানো যাবে না যেখানে তার নিরাপত্তা বা মানসিক স্থিতি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নিয়মিত মারধর, ভয় দেখানো, গুরুতর অপমান, অর্থনৈতিক শোষণ, জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণ বা অন্য কোনো বাস্তব ক্ষতি থাকলে তখন শুধু “আরও ভালো ব্যবহার করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে” বলা দায়িত্বশীল কথা না। প্রয়োজন হলে নিরাপদ দূরত্ব, বিশ্বস্ত আত্মীয়ের সহায়তা, কাউন্সেলিং, আলেমের পরামর্শ বা সংশ্লিষ্ট পেশাদার সাহায্য দরকার হতে পারে। দূরে থাকা কখনো সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য নয়, ক্ষতি কমানোর জন্যও হতে পারে। মা বাবার হক অনেক বড়, কিন্তু সেই হক বোঝাতে গিয়ে কারও বাস্তব ক্ষতিকে অস্বীকার করা যাবে না।

আবার সব সম্পর্ক আগের মতো ঘনিষ্ঠও হবে না। হয়তো আপনি এমন মা বা বাবার সঙ্গে আছেন যিনি কোনোদিন আপনার অনুভূতি খুব ভালোভাবে বুঝবেন না। আপনি তাঁকে বদলানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, কিছুটা ফল হয়েছে, কিছু হয়নি। তখন আপনার সামনে আরেক ধরনের পরিণত হওয়ার জায়গা আসে। মানুষটাকে তাঁর সীমাবদ্ধতাসহ দেখতে শেখা। তাঁর কাছ থেকে যেটা তিনি দিতে পারেন না সেটা প্রতিদিন দাবি করে নিজেকে ভাঙা নয়। হয়তো আপনার বাবার সঙ্গে গভীর emotional conversation কখনো হবে না, কিন্তু তিনি কাজে পাশে থাকেন। হয়তো মা আপনার career বুঝবেন না, কিন্তু অসুস্থ হলে রাত জাগবেন। আপনি তাঁর ভালোটা নেবেন, ভুল জায়গায় প্রয়োজনীয় সীমা রাখবেন, আর নিজের সব emotional প্রয়োজন এক মানুষ থেকেই পাওয়ার চেষ্টা করবেন না। বিশ্বস্ত বন্ধু, spouse, mentor, counsellor, ভালো community, এসব সম্পর্কও মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয়।

কোনো কোনো সন্তান আবার ভাবেন, “আমি আগে কথা বললে তো মনে হবে সব দোষ আমার।” না। আগে কথা বলা মানে দোষ স্বীকার করা নয়। অনেক সময় যে সম্পর্ককে বেশি মূল্য দেয়, সে আগে দরজা খোলে। আপনি মাকে ফোন করতে পারেন যদিও শেষ ঝগড়াটা তাঁর ভুলে হয়েছে। বাবাকে সালাম দিয়ে বসতে পারেন যদিও তিনিই আগে কষ্ট দিয়েছেন। এর মানে ইতিহাস বদলে গেল না। শুধু আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, নিজের অভিমানকে দিয়ে সম্পর্কের ভবিষ্যৎ পুরোটা লিখতে দেবেন না। একইভাবে মা বাবারও উচিত বয়সের অহংকার ছেড়ে কখনো সন্তানের ঘরে গিয়ে বলা, “চল, কথা বলি।” “আমি বাবা, আমি কেন আগে যাব?” এই একটি ভাবনা অনেক বাড়িতে বছরের পর বছর নীরবতা ধরে রাখে।

সম্ভব হলে পরিবারে কিছু নতুন অভ্যাস তৈরি করুন। সপ্তাহে অন্তত একদিন একসঙ্গে খাওয়া যেখানে ফোন দূরে থাকবে। কোনো সমস্যা হলে সবার সামনে না বলে আলাদা কথা বলা। খুব রেগে গেলে দশ মিনিট বিরতি নেওয়া। “তুমি সবসময়” ধরনের কথা না বলা। সন্তানের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আগে পুরোটা শোনা। মা বাবার প্রয়োজনের বিষয়ে সন্তানকে নিজে থেকে এগিয়ে আসা। ছোট ছোট নিয়ম শুনতে সাধারণ লাগে, কিন্তু সম্পর্কের পরিবেশ এগুলোতেই বদলায়। পরিবার শুধু ভালোবাসায় টিকে থাকে না, কিছু ভালো অভ্যাসেও টিকে থাকে।

এই নয় পর্বে আমরা রাগ, তর্ক, ভুল, ক্যারিয়ার, ঘর ছেড়ে যাওয়া, নেশা, হতাশা, আত্মহত্যার চিন্তা পর্যন্ত অনেক কঠিন জায়গায় এসেছি। কিন্তু এসবের মাঝখানে একটা জিনিস বারবার ফিরে আসে। মা বাবা আর সন্তানের সম্পর্ক খুব গভীর বলেই আঘাতটাও গভীর হয়। অপরিচিত কেউ আপনাকে ভুল বুঝলে কয়েকদিন পরে ভুলে যান। মা ভুল বুঝলে বছরের পর বছর মনে থাকে। কারণ তাঁর কাছে আপনার দাবি ছিল বেশি। একইভাবে সন্তান রাগ করে একটা কঠিন কথা বললে বাবা মায়ের কষ্টও এত বেশি হয়, কারণ সেই সন্তানের জন্য তাঁদের জীবনের অনেকটা জড়িয়ে আছে।

তাই সম্পর্কটা যখন আহত হয়, প্রথম প্রশ্ন সবসময় “কে বেশি ভুল করেছে?” হতে হবে না। কখনো প্রশ্নটা হতে পারে, “আমরা কি এমন কোনো জায়গায় ফিরতে পারি যেখানে দুজন মানুষ আবার একে অপরের কথা শুনতে পারবে?”

হয়তো প্রথম দিন শুধু সালাম পর্যন্ত হবে। দ্বিতীয় দিন পাঁচ মিনিট বসা। এক সপ্তাহ পরে একটা পুরোনো কষ্টের কথা। কিছুদিন পর কোনো একটা আচরণ বদলাবে। মাঝখানে আবার ঝগড়াও হবে। সম্পর্ক মেরামতের পথ সোজা হয় না। পুরোনো অভ্যাস আবার ফিরে আসে। কেউ আবার গলা উঁচু করে। কেউ পুরোনো অভিযোগ টেনে আনে। তখন ভাববেন না সব চেষ্টা নষ্ট হয়ে গেছে। আবার শুরু করবেন।

মা বাবা নিখুঁত মানুষ নন। সন্তানও না। একটা পরিবারে সবাই কখনো না কখনো অন্যজনকে কষ্ট দেয়। কিন্তু যে পরিবার ভুলের পর আবার কথা বলতে শেখে, নিজের অংশের দায় নেয়, ক্ষমা চাইতে শেখে, সীমা মানে, ভালোটা মনে রাখে এবং আল্লাহর কাছে একে অপরের জন্য দু‘আ করে, সেই পরিবারে ক্ষত থাকলেও সম্পর্কটা বেঁচে থাকতে পারে। হয়তো আপনি এখনও মা বাবার ওপর অভিমান করে আছেন। হয়তো তাঁদেরও আপনার ওপর আছে। সবকিছু আজই ঠিক করতে হবে না।

আজ শুধু একটা ছোট কাজ করতে পারেন। মায়ের পাশে কিছুক্ষণ বসুন। বাবাকে একটা ফোন দিন। কোনো প্রয়োজনের কাজটা বলে দেওয়ার আগেই করে দিন। আর সুযোগ পেলে একদিন শান্তভাবে বলুন, “আমাদের মধ্যে অনেক কিছু হয়েছে। আমি চাই না আমরা এভাবেই দূরে থাকতে থাকি।”

হয়তো ওপাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে আপনার আশা অনুযায়ী উত্তর আসবে না। তবু কথাটা বলা থাক। কারণ কখনো সম্পর্ক বাঁচানোর শুরুটা হয় কেউ একজন প্রথমে এইটুকু স্বীকার করলে, “আমি এখনও কষ্ট পাই। কিন্তু তবুও তুমি আমার আপন মানুষ। আমি চাই আমরা আবার একটু কাছে আসি।” এই সিরিজের শেষ কথা তাই “সব ভুলে যান” নয়।

কষ্টকে চিনুন। ভুলকে ভুল বলুন। প্রয়োজন হলে সীমা রাখুন। নিজের ভুলও দেখুন। সাহায্য নিন। কিন্তু যেখানে এখনও ভালো হওয়ার সুযোগ আছে, সেখানে অভিমানকে শেষ সিদ্ধান্ত নিতে দেবেন না। মা বাবা আর সন্তানের সম্পর্ক সবসময় নিখুঁত হবে না। কিন্তু অনেক ভাঙা সম্পর্কও আবার নরম হতে পারে, যদি কেউ একজন জেতার চেষ্টা একটু কমিয়ে বুঝতে চাওয়ার চেষ্টা শুরু করে।

অধ্যায় ১০

বোনাস | বেকার সন্তান, মা বাবা আর প্রতিদিনের চাপ

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

যখন চাকরি নেই, আয় নেই, আর ঘরের প্রতিটা কথাই নিজের অযোগ্যতার প্রমাণ মনে হয় সকাল দশটা। আপনি ঘর থেকে বের হতেই মা জিজ্ঞেস করলেন, “আজও কোথাও যাবে না?” একটু পর বাবা বললেন, “ওই চাকরিটার কী হলো?” আপনি উত্তর দিলেন, “এখনও কিছু জানায়নি।” তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “এভাবে আর কতদিন?” হয়তো কথাগুলো খুব সাধারণ। কিন্তু আপনি কয়েক মাস ধরে বেকার থাকলে এগুলো আর সাধারণ শোনায় না। গতকাল পাঁচটা জায়গায় আবেদন করেছেন, তার আগের দিন একটা ইন্টারভিউ দিয়েছেন, রাতে বসে নতুন কিছু শিখেছেন। তবু মনে হয় ঘরের মানুষগুলো আপনার সব চেষ্টা বাদ দিয়ে শুধু একটা জিনিসই দেখছে, আপনার এখনও চাকরি হয়নি।

বেকার থাকার কষ্ট শুধু টাকা না থাকার কষ্ট নয়। ধীরে ধীরে এটা মানুষের আত্মসম্মানে গিয়ে লাগে। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে, “কী করছিস এখন?” উত্তর দিতে অস্বস্তি হয়। আত্মীয়ের বাসায় যেতে ইচ্ছে করে না, কারণ আবার একই প্রশ্ন আসবে। নিজের ছোট কোনো প্রয়োজনের জন্য বাবার কাছে টাকা চাইতেও খারাপ লাগে। মা আপনার পছন্দের কিছু কিনে আনলে আনন্দের সঙ্গে অপরাধবোধও হয়, “আমি তো ঘরে কিছুই দিতে পারছি না।” তার ওপর যদি প্রায়ই শুনতে হয়, “অমুকের ছেলে চাকরি পেয়েছে”, “তোমার বয়সে আমরা সংসার চালিয়েছি”, “এত পড়াশোনা করে কী হলো?”, তখন একসময় চাকরি না পাওয়ার কষ্টটা বদলে গিয়ে মনে হয়, “হয়তো সত্যিই আমার দ্বারা কিছু হবে না।”

এই জায়গায় প্রথমে একটা কথা নিজের ভেতরে পরিষ্কার করতে হবে। আপনার এখন চাকরি নেই, তাই বলে আপনি অযোগ্য মানুষ নন। আবার চাকরি নেই বলে দায়িত্বহীনভাবে দিন কাটানোর সুযোগও আপনার নেই। এই দুই কথার মাঝের জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেউ এত কথা শুনতে শুনতে ভেঙে পড়ে, চেষ্টা কমিয়ে দেয়, সারাদিন ঘরে থাকে, তারপর আরও কথা শুনে আরও ভেঙে পড়ে। আবার কেউ এত defensive হয়ে যায় যে মা বাবা কিছু বললেই মনে করে তাঁরা তার শত্রু। তখন ভালো পরামর্শও আর শুনতে পারে না। দুটো অবস্থাই শেষ পর্যন্ত নিজের ক্ষতি করে।

বেকার অবস্থায় মা বাবাকে সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝানোর একটা উপায় হলো, আপনার চেষ্টা যেন শুধু আপনার মাথার ভেতরে না থাকে। তাঁরা যেন সেটা দেখতে পান। আপনি যদি দুপুরে ওঠেন, সারাদিন ফোনে থাকেন, মাঝে মাঝে একটা দুটো আবেদন করেন, তারপর বলেন “আমি চেষ্টা করছি”, তাঁদের ভয় কমবে না। তাই চাকরি না থাকলেও দিনের একটা নিয়ম থাকা দরকার। নির্দিষ্ট সময়ে ওঠা, সালাত, চাকরির আবেদন, CV ঠিক করা, ইন্টারভিউর প্রস্তুতি, নতুন skill শেখা, পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ, শরীরচর্চা, ঘরের কিছু দায়িত্ব, এগুলোকে দিনের অংশ বানান। সপ্তাহ শেষে নিজেও দেখুন আপনি আসলে কতটা কাজ করেছেন। বাবা জিজ্ঞেস করলে শুধু “চেষ্টা করছি” না বলে বলতে পারেন, “এই সপ্তাহে দশটা জায়গায় আবেদন করেছি, দুটো জায়গা থেকে উত্তর এসেছে, এই skill টা শিখছি, আগামী সপ্তাহে একটা interview আছে।” তখন কথাটা আর শুধু আশা না, দৃশ্যমান চেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক মা বাবার ভয় আসলে শুধু “চাকরি হলো না কেন” এই জায়গায় থাকে না। তাঁদের ভয় হয়, সন্তান হতাশ হয়ে চেষ্টা ছেড়ে দিচ্ছে কি না। কিন্তু তাঁরা সেই ভয় সবসময় সুন্দর ভাষায় বলতে পারেন না। বাবা বলেন, “সারাদিন বাসায় বসে থাকলে চাকরি আসবে?” আপনার কাছে অপমান মনে হয়। অথচ তাঁর ভেতরের ভয় হয়তো, “ছেলেটা হাল ছেড়ে দিচ্ছে না তো?” মা বলেন, “অমুকের মেয়েটা কত কিছু করছে”,

আপনি শুনলেন তুলনা। তাঁর ভেতরে হয়তো চিন্তা, “আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ কী হবে?” তাঁদের বলার পদ্ধতি ভুল হতে পারে, তুলনা সত্যিই কষ্ট দিতে পারে, কিন্তু কথার নিচে থাকা ভয়টা বুঝতে পারলে সব কথা ব্যক্তিগত আঘাত হিসেবেও নিতে হয় না।

তারপরও একই প্রশ্ন প্রতিদিন শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তখন চুপচাপ ক্ষোভ জমিয়ে রাখবেন না, আবার একদিন বিস্ফোরিতও হবেন না। শান্ত সময়ে বাবাকে বলতে পারেন, “আব্বু, আমি জানি আপনি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন। আমিও খুব চিন্তায় আছি। কিন্তু প্রতিদিন ‘কী হলো’ শুনলে আমার চাপটা আরও বেড়ে যায়। আমি চাই সপ্তাহে একদিন আপনাকে বসে সব update দিই। কোথায় আবেদন করেছি, কী শিখছি, কোথায় কথা এগোচ্ছে সব বলব। কিন্তু প্রতিদিন একই প্রশ্ন হলে আমার জন্য চেষ্টা ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায়।” মাকেও বলা যায়, “আম্মু, অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করলে আমার চেষ্টা করার শক্তি বাড়ে না, বরং নিজের কাছে নিজেকে ছোট লাগে। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করুন আজ কী করলাম, কিন্তু ‘অমুক পারল, তুমি পারলে না’ কথাটা না বললে আমার জন্য অনেক সহজ হয়।” তাঁরা হয়তো প্রথমে পুরোপুরি বুঝবেন না। তবু নিজের কষ্টটা অভিযোগ না করে পরিষ্কারভাবে বলা দরকার।

বেকার অবস্থায় আরেকটা বড় কষ্ট হলো অর্থের জন্য নির্ভরশীল থাকা। বয়স হয়েছে, কিন্তু মোবাইল বিল, যাতায়াত, কাপড়, ছোটখাটো খরচের জন্যও পরিবারের দিকে তাকাতে হচ্ছে। তখন আত্মসম্মানে লাগে। এই সময়ে নিজের খরচ সচেতনভাবে কমানো এবং যতটা সম্ভব halal ছোট আয়ের সুযোগ খোঁজা খুব উপকারী। আপনার মূল career এর চাকরি এখনও না হলেও tutoring, part time কাজ, freelance কাজ, temporary বা seasonal কাজ, পরিচিত কারও ব্যবসায় সাহায্য, এমন কিছু পাওয়া গেলে শুধু “এটা আমার level এর কাজ না” ভেবে ফিরিয়ে দেবেন না। সব কাজ আপনার স্থায়ী পেশা হবে না। কিন্তু নিজের কিছু খরচ নিজে বহন করতে পারলে আত্মবিশ্বাস ফেরে, পরিবারও দেখে আপনি চেষ্টা করছেন। বৈধ শ্রম কখনো ছোট নয়।

ইসলামও চেষ্টা আর রিযিককে একসঙ্গে দেখতে শেখায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম খাবার আর নেই, আর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম নিজের হাতের উপার্জন থেকে খেতেন। সহিহ বুখারি। আর তাওয়াক্কুলের হাদিসে পাখির উদাহরণ এসেছে, তারা সকালে খালি পেটে বের হয়, সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে। জামে আত তিরমিযি। পাখি রিযিকের মালিক না, আল্লাহই তাকে রিযিক দেন। কিন্তু সে বাসায় বসে থাকে না। আমাদের ক্ষেত্রেও তাওয়াক্কুল মানে শুধু "আল্লাহ দেবেন" বলে অপেক্ষা করা নয়। আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে চেষ্টা করা, দরজা ধরা, skill বাড়ানো, ব্যর্থতার পর আবার ওঠা, এটাও তাওয়াক্কুলের অংশ।

আল্লাহ বলেন, "মানুষের জন্য তাই আছে, যার জন্য সে চেষ্টা করে।" সূরা আন নাজম, ৫৩:৩৯। এর অর্থ এই নয় যে যত চেষ্টা করবেন তত দ্রুত আপনার পছন্দের চাকরিই পাবেন। দুনিয়ার ফল সবসময় আমাদের সময় অনুযায়ী আসে না। কিন্তু চেষ্টা আপনার দায়িত্ব। আবার আল্লাহ বলেন, যে তাঁকে ভয় করে, তিনি তার জন্য বের হওয়ার পথ করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে রিযিক দেন যা সে ধারণাও করেনি। সূরা আত তালাক, ৬৫:২ থেকে ৩। তাই ইস্তিগফার করবেন, দু'আ করবেন, সালাতের যত্ন নেবেন, একই সঙ্গে application পাঠাবেন, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং নিজের যোগ্যতাও বাড়াবেন। দু'আ আর চেষ্টা একে অপরের বিকল্প নয়।

কয়েক মাস ধরে একইভাবে চেষ্টা করেও যদি ফল না আসে, তখন শুধু আরও application পাঠানো নয়, নিজের পদ্ধতিটাও দেখুন। CV কি ঠিক আছে? অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে দেখিয়েছেন? ইন্টারভিউতে কোথায় দুর্বল হচ্ছেন? আপনার field এ বর্তমানে কোন skill বেশি দরকার? Portfolio দরকার হলে আছে কি? পরিচিতরা জানে আপনি চাকরি খুঁজছেন? অনেক সময় মানুষ লজ্জায় কাউকে বলতে চায় না। অথচ একটা সহজ কথা, "আমি এই field এ কাজ খুঁজছি, কোনো vacancy দেখলে

জানাবেন”, নতুন একটা দরজা খুলতে পারে। networking মানে কারও কাছে হাত পেতে চাকরি চাওয়া নয়। নিজের availability আর দক্ষতার কথা মানুষের জানা থাকাও প্রয়োজন।

চাকরি না থাকলেও ঘরের ভেতরে নিজের দায়িত্ব ভুলে যাবেন না। মা রান্না করছেন, বাবা বাজার করছেন, ঘরে বিভিন্ন কাজ পড়ে আছে, আর আপনি শুধু job search এর নামে নিজের ঘরে থাকছেন, এটা দীর্ঘদিন চললে পরিবারের ক্ষোভ বাড়তে পারে। এখন হয়তো টাকা দিতে পারছেন না, কিন্তু সময় দিতে পারেন। বাজার করতে পারেন, বাবা মাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেন, ছোট ভাইবোনের পড়াশোনায় সাহায্য করতে পারেন, প্রয়োজনীয় online কাজ করে দিতে পারেন, ঘরের কোনো দায়িত্ব নিজের ওপর নিতে পারেন। পরিবারের সদস্য হিসেবে অবদান শুধু টাকা দিয়ে হয় না। মা বাবা যখন দেখেন সন্তান আয় করতে পারছে না, কিন্তু দায়িত্ব থেকে পালাচ্ছে না, সেটাও তাঁদের মনে ভরসা তৈরি করে।

তবে ঘরের দায়িত্ব নিতে গিয়ে নিজের ভবিষ্যতের সময়টাও হারাবেন না। পরিবারের কেউ যদি ভাবে “ও তো বেকার, সব কাজ ও করবে”, তখন সম্মান রেখে নিজের সময় ঠিক করতে হবে। বলতে পারেন, “এই কাজগুলো আমি করব, কিন্তু সকাল নয়টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত চাকরির আবেদন আর শেখার সময়টা রাখতে চাই।” বেকার হওয়া মানে আপনার সময়ের কোনো মূল্য নেই, এমন না। বরং এই সময়টাই সবচেয়ে গুছিয়ে ব্যবহার করা দরকার।

সবচেয়ে কঠিন হয় যখন বারবার rejection আসে। প্রথম কয়েকটা rejection এ মানুষ ভাবে, আরেকটা চেষ্টা করব। বিশ ত্রিশটা application এর পর মনে হয়, “সমস্যাটা কি আমার মধ্যেই?” তারপর সেদিনই যদি বাবা জিজ্ঞেস করেন, “কতদিন আর?”, একটা সাধারণ কথাও ছুরির মতো লাগে। এই সময় মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একটা company আপনাকে নেয়নি মানে তারা ওই পদে আপনাকে নেয়নি। এর মানে এই নয় যে আপনার পুরো জীবনের ওপর verdict হয়ে গেছে। নিজের অগ্রগতি শুধু offer দিয়ে মাপবেন না। আগের চেয়ে interview call

বাড়ছে কি না, CV ভালো হয়েছে কি না, নতুন skill এসেছে কি না, interview তে আগের চেয়ে confident কি না, এসবও progress। আর যদি দীর্ঘদিনেও কোনো উন্নতি না হয়, তখন নিজের worth নিয়ে সন্দেহ না করে strategy বদলান।

এখানে মা বাবার জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা আছে। বেকার সন্তানকে প্রতিদিন অপমান করলে সে দ্রুত চাকরি পায় না। “তুই আমাদের বোঝা”, “তোর পেছনে এত টাকা নষ্ট করেছি”, “অমুক কোথায় চলে গেছে আর তুই কোথায়”, “তোর দ্বারা কিছু হবে না”, এই কথাগুলো motivation নয়। এগুলো একজন মানুষকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পারে যেখানে সে নিজের চেষ্টা লুকাতে শুরু করে, rejection গোপন করে, পরিবারের সামনে কম আসে, এমনকি নতুন সুযোগের জন্য চেষ্টা করার শক্তিও হারায়। সন্তান যদি চেষ্টা না করে, তাকে দায়িত্বশীল করুন। জিজ্ঞেস করুন, “এই সপ্তাহের plan কী?” বলুন, “CV টা কাউকে দেখাও”, “প্রতিদিন কিছু সময় skill শেখো।” কঠিন কথাও বলা যায় মানুষটাকে ছোট না করে।

মা বাবাদের এটাও মনে রাখা দরকার, চাকরি পাওয়া শুধু সন্তানের চেষ্টার ওপর নির্ভর করে না। কাজের বাজার, দেশ, শহর, অভিজ্ঞতা, sector, সময়, কখনো visa বা ভাষা, অনেক কিছুর ভূমিকা থাকে। তাই প্রথমে দেখুন সন্তান সত্যিই চেষ্টা করছে কি না। যদি করে, তার জন্য ঘরটাকে এমন জায়গা বানান যেখানে rejection এর পর সে ফিরে এসে একটু শক্তি পায়। পৃথিবী তাকে “না” বলছে, ঘরেও যদি প্রতিদিন তাকে বলা হয় “তুই ব্যর্থ”, তাহলে সে দাঁড়াবে কোথায়?

অন্যদিকে সন্তানকেও শুধু “আমাকে pressure দেবেন না” বলে থেমে গেলে হবে না। আপনার পরিবারও আপনার কাছ থেকে একটা plan দেখতে চাইবে। নিজের জন্য সময়সীমা ঠিক করতে পারেন। ধরুন, আগামী দুই মাস নির্দিষ্ট ধরনের চাকরিতে চেষ্টা করবেন। ফল না এলে CV বদলাবেন, নতুন skill যোগ করবেন, অন্য ধরনের role দেখবেন। নিজের dream job এর অপেক্ষায় সব ছোট সুযোগ ফিরিয়ে দেওয়াও সবসময় বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কোনো কাজ থেকেই হয়তো এমন অভিজ্ঞতা আসবে যা পরে আপনার আসল career এর দরজা খুলে দেবে।

আত্মীয়দের প্রশ্ন নিয়েও নিজের একটা সহজ উত্তর ঠিক করে রাখুন। “চাকরি হলো না এখনও?” “এখন কী করো?” প্রত্যেক মানুষকে আপনার পুরো struggle ব্যাখ্যা করতে হবে না। বলতে পারেন, “চেষ্টা করছি, কয়েকটা জায়গায় কথা চলছে, দু‘আ করবেন।” তারপর অন্য বিষয়ে চলে যান। নিজের জীবন নিয়ে সবার সামনে defence দিতে হবে না। পরিবারকেও বলতে পারেন, আপনার চাকরির বিষয়টা সবার সামনে বিস্তারিত আলোচনা না করলে আপনি বেশি স্বস্তি পান।

বন্ধুবান্ধব থেকেও পুরোপুরি দূরে চলে যাবেন না। বন্ধু চাকরি পেয়েছে, আপনার হয়নি, তার success দেখলে কষ্ট লাগতে পারে। কিন্তু লজ্জায় সবাইকে এড়িয়ে গেলে isolation আরও বাড়ে। এমন মানুষের কাছে থাকুন যারা আপনার হতাশা বাড়ায় না, আবার শুধু “সব ঠিক হয়ে যাবে” বলেও থেমে থাকে না। কেউ vacancy পাঠায়, কেউ CV দেখে, কেউ interview practice করায়, কেউ আপনার কথা শোনে। এই মানুষগুলোও আল্লাহর দেওয়া মাধ্যম হতে পারে।

আর যদি দেখেন কয়েক মাস ধরে কোনো কিছুতেই মন বসছে না, ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বা সারাদিন ঘুমাতে ইচ্ছে করছে, মানুষের সামনে যেতে ভয় লাগছে, নিজের ওপর তীব্র ঘৃণা তৈরি হচ্ছে, বারবার মনে হচ্ছে আপনি পরিবারের বোঝা, তখন এটাকে শুধু “চাকরি নেই তাই এমন” বলে ফেলে রাখবেন না। বিশ্বস্ত কারও সঙ্গে কথা বলুন। প্রয়োজন হলে কাউন্সেলর বা মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন। চাকরি খোঁজা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেই চাকরি খোঁজার মানুষটাকেও সুস্থ রাখা জরুরি।

সবশেষে মা বাবা আর সন্তান দুপক্ষেরই একটা কথা মনে রাখা দরকার। বেকারত্ব একটা সময়ের অবস্থা, কোনো মানুষের পরিচয় নয়। আজ আপনার ছেলে চাকরিহীন বলে সে শুধু “বেকার ছেলে” না। আজ আপনার মেয়ে আয় করছে না বলে তার মূল্য কমে যায়নি। আবার সন্তানও মনে রাখবে, “আমার চাকরি নেই” সত্য হতে পারে, কিন্তু “তাই আমার কোনো দায়িত্ব নেই” সত্য নয়।

আপনি যদি এখন এই সময়টার মধ্যে থাকেন, তাহলে আগামীকাল থেকে সব বদলে যাবে এমন কথা নিজেকে বলতে হবে না। বরং আজ একটা CV ঠিক করুন। একটা application দিন। একজন পরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলুন। একটা skill এর প্রথম lesson শুরু করুন। ঘরের একটা কাজ নিজের দায়িত্বে নিন। আর মা বাবার সঙ্গে বসে বলুন, "আমি কী করছি সেটা আপনাদের নিয়মিত জানাব। শুধু একটা অনুরোধ, আমাকে অন্যদের সঙ্গে তুলনা না করে আমার চেষ্টা দিয়ে বিচার করবেন।"

আর মা বাবা যদি এই লেখা পড়েন, সন্তানকে একবার জিজ্ঞেস করতে পারেন, "তুই কী plan করেছিস? কোথায় আমার সাহায্য লাগবে?"

হয়তো এই প্রশ্নটাই "কিছু হলো না এখনও?" প্রশ্নটার চেয়ে তাকে অনেক বেশি এগিয়ে দেবে।

চাকরি হয়তো আজ হয়নি। আগামী মাসেও নাও হতে পারে। কিন্তু আপনার কাজ হলো চেষ্টা বন্ধ না করা, নিজের দিনকে নষ্ট না হতে দেওয়া এবং বেকারত্বকে নিজের আত্মসম্মান খেয়ে ফেলতে না দেওয়া। চাকরি না থাকা আপনার বর্তমান অবস্থা। এটা আপনার পরিচয় নয়। আর মা বাবাকে হয়তো একদিন শান্তভাবে শুধু এটুকুই বলতে হবে, "আমি বসে নেই। আমি চেষ্টা করছি। হয়তো সময় লাগছে। আমার জন্য দু'আ করুন, আর আমাকে এমনভাবে পাশে রাখুন যেন চেষ্টা করার শক্তিটা না হারাই।"

মূল সূত্র ও পর্যালোচনার সীমা

যেখানে “বিষয় মিলেছে” লেখা আছে, সেখানে উল্লেখিত বর্ণনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বক্তব্য তুলনা করা হয়েছে। এটি প্রতিটি বাক্যের অনুবাদ, সব ফিকহি সিদ্ধান্ত, সনদ বা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের চূড়ান্ত অনুমোদন নয়। কুরআনের লিংকগুলো মূল লেখার উদ্ধৃতির নির্দেশিকা; এই ব্যাচে প্রতিটি আরবি হরকত ও অনুবাদের শব্দভিত্তিক নতুন যাচাই করা হয়নি।

১. যখন মনে হয়, “মা বাবা আমার কেউ না”

সূরা আল ইসরা ১৭:২৩ ও ২৪

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সূরা লুকমান ৩১:১৪ ও ১৫

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

২. মা বাবার সঙ্গে তর্ক করা কি সত্যিই হারাম? তাঁরা ভুল বললে আমি কী করব?

সূরা আল ইসরা ১৭:২৩

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সূরা লুকমান ৩১:১৫

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সহিহ বুখারি ৭২৫৭: আনুগত্য ন্যায়সঙ্গত কাজে

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

৩. তাঁরা যখন খুব রেগে যান, তখন আমি কী করব?

সহিহ বুখারি ৬১১৪: রাগের সময় আত্মসংযম

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

৪. মা বাবা ভুল করলে কীভাবে বলব? সম্মান করতে গিয়ে কি সবকিছু চুপ করে সহ্য করতে হবে?

সূরা মারইয়াম ১৯:৪২ থেকে ৪৭

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সূরা লুকমান ৩১:১৫

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

৫. যখন মনে হয়, “আমার পরিবারই আমাকে সামনে এগোতে দেয় না”

সূরা লুকমান ৩১:১৫: ভুলের সঙ্গে একমত না হয়েও সদাচরণ

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

৬. রাগ করে বাসা থেকে বের হয়ে যেতে ইচ্ছে করলে কী করবেন?

সহিহ বুখারি ৬১১৪: রাগের সময় আত্মসংযম

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

৭. ঘরের কষ্ট থেকে যখন নেশার দিকে পালাতে ইচ্ছে করে

সূরা আল মায়িদা ৫:৯০ ও ৯১

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সহিহ মুসলিম ২০০৩a: নেশাসৃষ্টিকারী বস্তু

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

SAMHSA: What is a substance use disorder?

প্রকাশিত নির্দেশনা মিলেছে

NIAAA: Understanding relapse

প্রকাশিত নির্দেশনা মিলেছে

NHS: Alcohol-use disorder ও withdrawal

প্রকাশিত নির্দেশনা মিলেছে

৮. যখন মনে হয়, “আর বাঁচতে চাই না”

NIMH: Depression

স্বাস্থ্যসেবা ও উপসর্গের সীমা বোঝাতে যুক্ত

সূরা আন নিসা ৪:২৯, প্রাসঙ্গিক অংশ

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সূরা আয যুমার ৩৯:৫৩, প্রাসঙ্গিক অংশ

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সূরা আল বাকারা ২:২৮৬, প্রাসঙ্গিক অংশ

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সহিহ বুখারি ৫৬৭১: কষ্টে মৃত্যু কামনা ও দু’আ

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

NIMH: সহায়তার পাঁচটি পদক্ষেপ

প্রকাশিত নির্দেশনা মিলেছে

৯. এত কিছুর পরেও সম্পর্কটা কি আবার সুন্দর করা সম্ভব?

সূরা আল ইসরা ১৭:২৪

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সহিহ মুসলিম ২৫৯৪a: কোমলতা

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

১০. বোনাস | বেকার সন্তান, মা বাবা আর প্রতিদিনের চাপ

সূরা আন নাজম ৫৩:৩৯

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

সূরা আত তালাক ৬৫:২ ও ৩

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

নতুন তথ্যের উৎস ও সম্পাদনার সীমা এই তালিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। কোনো স্বাধীন পর্যালোচকের অনুমোদন বা স্বাক্ষর দেওয়া হয়নি। বইটি এখনও অপ্রকাশিত Review Edition।